নানাসাহেব

প্রথম প্রকাশ

জুলাই। ১৯৫৭

দাম দুই টাকা

প্রচ্ছদ ও টাইটেল পেজ : কে, পাল

নানাসাহেব : শ্রীদীপায়ন বাগচি

লক্ষীবাঈ : সুধাময় দাসগুপ্ত

শরৎ পুস্তকালয়, ৩ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২ হইতে শ্রীপ্রণবকুসুম সাহা কর্তৃক প্রকাশিত ও ব্যবসা-ও-বাণিজ্য প্রেস, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীসন্তোষকুমার ধর কর্তৃক মুদ্রিত।

নানাসাহেব

মণি বাগচি

শরৎ পুস্তকালয়
৩, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

'যুগান্তর'-পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক

ও

সাহিত্য-সব্যসাচী

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

—বন্ধুবরেষু

নানাসাহেব

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ

॥ এই লেখকের ॥

সুভাষচন্দ্র ● কামালপাশা ● কাজলরেখা ছোটদের বার্ণার্ড শ ● ছোটদের অরবিন্দ ছোটদের বিবেকানন্দ ● ছোটদের গৌতম বুদ্ধ ● নিবেদিতা ● গৌতম বুদ্ধ সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস ইত্যাদি।

॥ পরবর্তী বই ॥

আমাদের বিদ্যাসাগর ● চিত্তরঞ্জন

মাও সে-তুঙ্

॥ এক ॥

বিঠুরের রাজপথ দিয়ে ছুটে চলেছে দুটো ঘোড়া—একটি শাদা, একটি কালো। শাদা ঘোড়ার সওয়ারী একটি মেয়ে—বয়স তার সাত বছর। কালো ঘোড়ার সওয়ারী একটি ছেলে—বয়স আঠার বছর। ঘোড়া দুটো যেমন তেজী, তেমনি ক্ষিপ্র তাদের গতি। রাস্তার দুধারে জানলা থেকে উদ্‌গ্রীব নর-নারী চেয়ে দেখে কিশোর-কিশোরীর এই অশ্ব চালনা—কেমন সুন্দর ভাবে তারা ধরেছে ঘোড়ার লাগাম! ছোট্ট দুখানি তরবারী ঝুলছে দুজনের কোমর থেকে। দুজনেরই মাথায় শিরস্ত্রাণ—সকালবেলার সূর্যের দীপ্ত আলো ঠিকরে পড়ছে তাতে। বীরত্বের প্রতিমা যেন দুটি! পথচারী সসম্ভ্রমে তাদের পথ ছেড়ে দেয়। পাশাপাশি চলেছে দুজনে। নগর সীমান্তে এসে থামল দুজন।

—মনু, চলো এবার ফিরি, কিশোর বললে।

—চলো না ভাই, আর একটু ঘুরে আসি, উত্তর দিল কিশোরী, একটু হেসে।

—না, দেরী হয়ে যাবে।

তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে দুজনে ফিরে আসে প্রাসাদে।

মুহুর্মুহু হ্রেষাধ্বনি করতে করতে ঘোড়া দুটি এসে থামল প্রাসাদ তোরণে। তাদের মুখের কজাই-এর দুপাশ বেয়ে ঝরছে ফেনপল্লব। প্রাসাদের সকলের বিস্ময়াহত মুখ দিয়ে শব্দ বেরুলো—অপূর্ব।

অপূর্ব এই কিশোর! আর অপরূপা এই কিশোরী।

এই কিশোর নানাসাহেব—ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব! পুনার প্রসিদ্ধ পেশবা বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র।

এই কিশোরী লক্ষ্মীবাঈ—ঝাঁসীর বীরাঙ্গনা রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

ভারতের ইতিহাসের আকাশে দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র—কালের প্রান্তর পার হয়ে যাদের দ্যুতি আজো ঝলমল্ করছে।

সেতারা, নাগপুর ও পুনা—এক সময়ে এই তিন জায়গায় ছিল তিনটি মারাঠা বংশ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে সেতারা, নাগপুর আর পুনা।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষে চলেছে কোম্পানীর রাজত্ব—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। লর্ড ডালহৌসি তখন গভর্ণর-জেনারেল। তিনিই ছিলেন এ সময়ে ভারতের ভাগ্যবিধাতা। আট বছর কাল ধরে তিনি শাসন করেছিলেন এই দেশ। এই আট বছরের মধ্যে তিনি ভারতবর্ষের মানচিত্র বদ্‌লিয়ে দিয়েছিলেন—ভারতের অনেক স্বাধীন রাজ্য একে একে জোর করে তুলে নিয়েছিলেন কোম্পানীর হাতে। আবার দেশীয় রাজাদের অনেকগুলো রাজ্য তিনি বিনা যুদ্ধেই গ্রাস করেছিলেন। সে আর কিছুই নয়—রাজনীতির কৌশল। ডালহৌসি একটা অদ্ভুত ধরণের আইন তৈরী করেছিলেন।

আমাদের দেশে হিন্দুদের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, যদি কারো ছেলে না হয়, তাহলে সে অন্য কারো ছেলেকে নিজের ছেলের মত লালন-পালন করতে পারে এবং মারা যাবার সময়ে সেই ছেলেকেই সে তার সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যেতে পারে। একেই আমাদের শাস্ত্রে বলে দত্তক-নেওয়া আর যে ছেলেকে দত্তক নেওয়া হয়, তাকে বলে দত্তকপুত্র। আমাদের নানা-সাহেব ছিলেন বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র। এইভাবে দত্তক নেওয়া শাস্ত্রীয় বিধি ছিল এবং সমাজ কারো দত্তকপুত্রকে তার নিজের ঔরসজাত ছেলের মতই মর্যাদা দিত।

কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষে ছোট ছোট অনেকগুলো স্বাধীন রাজা ছিল। সেই সব রাজ্যের অনেক রাজারই কোন

সন্তান থাকত না। তাই রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরা দত্তকপুত্র নিতেন।

ডালহৌসি দেখলেন এই একটা মস্ত বড় সুযোগ। দেশীয় রাজারা স্বাধীন হলেও তাঁরা ছিলেন কোম্পানীর আশ্রিত। কাজেই অনেক ব্যাপারে কোম্পানীর বিধি-বিধান তাঁদের মেনে চলতে হতো এবং প্রত্যেকের রাজ্যেই থাকতেন একজন করে কোম্পানীর প্রতিনিধি। এঁদের বলা হতো রেসিডেন্ট। ডালহৌসি আইন করলেন—যে সব রাজা দত্তক নেবেন, কোম্পানী তা অনুমোদন করবেন এবং কোম্পানী অনুমোদন না করলে সেই রাজ্য রাজার মৃত্যুর পর কোম্পানীর হাতে চলে যাবে; কিন্তু রাজা সেই দত্তক পুত্রকে যে সব বিষয়-সম্পত্তি দিয়ে যাবেন, কোম্পানী তাতে হাত দেবেন না।

এই রকম আশ্রিত রাজ্যের মধ্যে সেতারা, নাগপুর ও পুনার রাজারা ছিলেন মারাঠা বংশের সন্তান। ডালহৌসির এই আইনের আঘাত সর্বপ্রথমে গিয়ে পড়ল সেতারা রাজ্যের ওপর। সবাই বিস্ময়ে, আতঙ্কে ও ভয়ে চমকে উঠল। এ কী বিচিত্র বিধান কোম্পানীর! এ যে ধর্মের ওপর আঘাত; দত্তক-নেওয়া যে আমাদের শাস্ত্রেই আছে। কিন্তু এসব প্রতিবাদে কান দেবার মত মানুষ ছিলেন না ডালহৌসি। যেমন করে হোক ভারতে কোম্পানীর রাজত্বের পরিধি বাড়াতে হবে—ছলে বলে অথবা কৌশলে। সেইজন্য ডালহৌসির এই আইন, আইন নয়, রাজনীতির একটা কৌশল মাত্র—এই কথাই বলতে লাগল সকলে।

এর আগে অস্ত্রের বলে তিনি অধিকার করেছেন আরো দুটো খুব বড়ো বড়ো রাজ্য—পাঞ্জাব ও ব্রহ্মদেশের পেগু। এইবার আইনের নামে তিনি বিস্তার করলেন কৌশলের জাল।

প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল সেতারার ওপর। তাঁর সর্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রথম আহুতি সেতারা। ছত্রপতি শিবাজীর সেতারা।

এই সেতারার দুর্গ থেকেই শিবাজী তাঁর গুরু রামদাস স্বামীকে ভিক্ষা করতে দেখে, সমস্ত মারাঠা রাজ্য একদিন তাঁরই চরণে অর্পণ করেন এবং গৈরিক পতাকা উড়িয়ে বৈরাগীর উত্তরীয় সযত্নে ধারণ করেন। শিবাজীর তূর্যনিনাদে একদিন দুর্ধর্ষ মোগল বাদশা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিলেন। একদিন মহারাষ্ট্রের প্রান্তর থেকে ছত্রপতির বজ্রশিখা যুগান্তের বিদ্যুদ্‌-বহ্নিতে দিগ্‌দিগন্তে এঁকে দিয়েছিল স্বাধীনতার মহামন্ত্রলেখন। সেই শিবাজীর সেতারা ডালহৌসির কলমের একটি খোঁচায় কোম্পানীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

মারাঠাবীর শিবাজীর বংশধর প্রতাপসিংহকে রাতের অন্ধকারে বিনা বিচারে নির্বাসিত করে, তাঁর সমস্ত ধন-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, ডালহৌসি সেতারা অধিকারের পথ নিষ্কণ্টক করলেন। কৃষ্ণার জলপ্রপাতে সেদিন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল সেতারার মর্মব্যথা। মৃত্যুর আগে রাজ্যভ্রষ্ট প্রতাপসিংহ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে একটি দত্তক গ্রহণ করেন। ডালহৌসি সে-দত্তক অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। সেতারার গদির কোন উত্তরাধিকারী নেই—এই কারণ দেখিয়ে ডালহৌসি সেই রাজ্যটি গ্রাস করলেন। এ ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে একশো আট বছর আগে।

তারপর ডালহৌসির শ্যেন দৃষ্টি পড়ল নাগপুরের ওপর।

এই নাগপুর রাজ্য ছিল ভোঁসলা রাজাদের অধিকারে। ভোঁসলারাও মারাঠা।

নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সঙ্গে ইংরেজ একটা সন্ধি করেছিল। সেই সন্ধিতে বলা হয় যে, তাঁর রাজ্য পুরুষানুক্রমে ভোঁসলা-বংশের অধীনেই থাকবে। সাতাশ বছর পরে তৃতীয় রঘুজী মারা গেলেন। তাঁর বড়রাণী বঙ্কবাঈ তাঁর স্বামীর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বালককে দত্তক নিলেন। নাগপুর

প্রাসাদে বৃটিশ রেসিডেন্টের সামনে যথাবিধি এই কাজের অনুষ্ঠান হয়।

কিন্তু ডালহৌসির বুভুক্ষা তখন সর্বগ্রাসী। পরওয়ানা জারি হলো—নাগপুর রাজ্যের আসল উত্তরাধিকারী কেউ নেই। অতএব এ-রাজ্যের মালিক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। নাগপুর রাজ্য ভোঁসলাদের হাত থেকে চলে গেল। বঙ্কবাঈ-এর আবেদন কোম্পানীর দরবারে গ্রাহ্য হলো না। তিনি বিলেতে পর্যন্ত আপিল করলেন, কিন্তু ফল কিছুই হলো না। রাজ্য তো গ্রাস করলেনই, সেই সঙ্গে ভোঁসলা-বংশের বিপুল ধন-ভাণ্ডার পর্যন্ত ইংরেজের অধিকারে চলে গেল। প্রাসাদের অন্দরমহল থেকে রাণীদের লক্ষ লক্ষ টাকার মণি-মুক্তা পর্যন্ত সেদিন কোম্পানী লুঠ করতে দ্বিধা বোধ করেনি।

ডালহৌসির অনেক আগেই পুনা রাজ্য ইংরেজের হস্তগত হয়েছিল।

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে পেশবা বাজীরাও কোম্পানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কোম্পানী তাঁর রাজ্য নিয়ে তাঁকে বিঠুরে একটা জায়গীর দিলেন। বিঠুরের জায়গীর ও কোম্পানীর কাছ থেকে বছরে আট লক্ষ টাকা বৃত্তি পেয়ে বাজীরাও শেষ জীবনে অগাধ ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েছিলেন।

বাজীরাও-এর কোন ছেলে ছিল না। তিনি দত্তক-পুত্র গ্রহণ করে, তাঁকেই পেশবা উপাধি ও বার্ষিক বৃত্তি দেবার জন্য কোম্পানীর কাছে আবেদন করলেন। কোম্পানী বাজীরাও-এর কাছ থেকে অনেক উপকার পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করলেন। বাজীরাও মারা গেলে পরে এই দত্তক পুত্রই বিঠুরের অধিপতি হলেন। এই দত্তক পুত্রই ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁকে বলতেন নানাসাহেব।

আজ থেকে একশো বছর আগে ভারতবর্ষে যে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল, নানাসাহেব ছিলেন সেই বিদ্রোহের নায়ক।

॥ দুই ॥

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে মারাঠাদের সমস্ত ক্ষমতা ও গৌরব লোপ পেল। বাজীরাও তখন শেষ পেশবা। তিনি শেষবারের মতো ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু কিছুই লাভ হলো না। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে বাজীরাও ইংরেজ সেনাপতি স্যার জন্ ম্যাল্‌কমের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। সেদিন তারিখ ছিল ৩রা জুন, ১৮১৮। তারপর পুনার দরবারে শেষবারের মতো সিংহাসনে বসে মারাঠার শেষ পেশবা ইংরেজ সেনাপতির সামনে ঘোষণা করলেন: "আজ থেকে আমি, দ্বিতীয় বাজীরাও, পেশবা পদবী ত্যাগ করলাম।" তারপর মহামান্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনা দরবারের শাসন-ভার নিজেদের হাতে গ্রহণ করলেন।

ইংরেজ সেনাপতি বাজীরাও-এর করমর্দন করে বললেন: "কোম্পানী আপনাকে বছরে আট লক্ষ টাকা করে বৃত্তি দিতে রাজী হয়েছেন। আপনি এই কাগজটায় সই করুন।"

কাগজে নয়, সন্ধিপত্রে পেশবার নামাঙ্কিত মুদ্রা শেষবারের মতো অঙ্কিত হলো। সেই সন্ধিপত্রে বাজীরাও তাঁর সমস্ত স্বত্ব ও রাজকীয় ক্ষমতা ত্যাগ করলেন।

মহামান্য পেশবা হলেন কোম্পানীর বৃত্তিভোগী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সেদিন ইতিহাসের চাকা এইভাবেই ঘুরে গিয়েছিল।

ইংরেজ সৌজন্য দেখাল, কিন্তু চিরদিনের মতো খর্ব করে দিল মারাঠাশক্তিকে—যে মারাঠা শক্তির কাছে মোগলকে বার বার হয়রান হতে হয়েছিল।

পুনা থেকে বাজীরাও চলে এলেন একেবারে উত্তর-পশ্চিম

প্রদেশে। কানপুরের কাছে বিঠুর বলে একটা জায়গা ছিল। সেখানে গঙ্গার তীরে মনোরম নির্জন স্থানটি বাজীরাও-এর খুব পছন্দ হলো। তিনি বিঠুরে থাকবার অনুমতি চাইলেন। কোম্পানীর সরকার তাঁকে সে-অনুমতি দিলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন তাঁর আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী এবং বহু মারাঠা প্রজা। সৈন্য সামন্তও কিছু গেল তাঁর সঙ্গে। গেল হাতী ও ঘোড়া। তৈরী হলো বিঠুরে তাঁর জন্যে নতুন প্রাসাদ। দেখতে দেখতে সেই প্রাসাদ ধনে জনে ঐশ্বর্যে ভরে ওঠে।

কোম্পানী বাজীরাওকে বিঠুরে একটা জায়গীর দিলেন। সেখানে তাঁর বহু মারাঠা প্রজা এসে বাস করতে লাগল। অল্পদিনের মধ্যেই বিঠুর হয়ে উঠল ছোটখাটো একটা শহর। নতুন দুর্গ তৈরী হলো সেখানে। কোম্পানী এই সময়ে রাজ্যচ্যুত পেশবার প্রতি আর একটু সৌজন্য দেখালেন। বিঠুরের অধিবাসীরা গভর্ণমেণ্টের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসন থেকে বিমুক্ত হলো। সেখানে ভূতপূর্ব পেশবার-ই শাসন ব্যবস্থা চলতে লাগলো। বাজীরাও এইভাবে বিঠুরে বাস করতে লাগলেন।

দিন যায়।

বিঠুরের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

সেখানে দুর্গ, সৈন্য, কামান সবই আছে। আছে অসংখ্য মারাঠা বীর। আর আছেন বাজীরাও। তবে কী ভূতপূর্ব পেশবা বিঠুরে বসে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন চক্রান্ত করছেন? অসম্ভব নয়। মারাঠার হাতে মোগল কি রকম লাঞ্ছিত হয়েছিল, অতীতের সে-ইতিহাস তো সেদিনের ঘটনা মাত্র। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মনে জাগে ভয়। ভয়ের আরো একটা কারণ ছিল—সে সময়ে দেশের সর্বত্র শান্তি ছিল না। ভারতে ইংরেজ কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তার শুরু হয়েছে, কিন্তু তখনো পর্যন্ত অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার ভাবটা কমে নাই।

তার ওপর মারাঠারা যুদ্ধকুশল-জাত। সেই জাতের এতগুলো লোক যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে ভাবনার কথা বৈকি? এই সব ভেবে কোম্পানীর সরকার একটু সতর্ক হলেন। দূর থেকে তাঁরা দৃষ্টি রাখলেন বিঠুরের ওপর আর সেই সঙ্গে বিঠুরের নতুন জায়গীরদার বাজীরাও-এর ওপর।

কিন্তু বাজীরাও-এর মনে কোনো মতলব ছিল না। তিনি এখন গভর্ণমেণ্টের বিশ্বস্ত বন্ধু। শুধু বন্ধু নন, ইংরেজের দুঃসময়ে তাঁদের সাহায্য করতে তিনি ত্রুটি করতেন না। যখন আফগানিস্তানের যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের কোষাগার শূন্য হলো, তখন ইংরেজ টাকার অভাবে কাতরভাবে চারদিকে তাকাল। বাজীরাও তখন পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দিলেন গভর্ণমেণ্টকে। তারপর পাঞ্জাব যখন ইংরেজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, যখন রণদুর্মদ খালসা সৈন্য ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করবে বলে অসীম সাহসে শতদ্রু পার হয়, তখন বাজীরাও কোম্পানীকে নিজের খরচে এক হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন। কোম্পানী ভূতপূর্ব পেশবার নতুন বন্ধুত্বের প্রমাণ পেলেন।

এইভাবে সৌজন্য আর বন্ধুত্ব দেখিয়ে বাজীরাও গভর্ণমেণ্টের খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলেন। তিনি ভুলেই গেলেন যে এক সময়ে তিনি ছিলেন পুনার পেশবা—ভুলেই গেলেন যে এক-সময়ে তাঁরই ভীষণ প্রতাপে সারা পশ্চিমভারত কেঁপে উঠত। যে ইংরেজ কোম্পানী একসময়ে পেশবার ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত, এখন তিনিই সেই কোম্পানীর আশ্রয়ে থেকে তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করে তাদের খুশি করতে লাগলেন। বিপদে-আপদে তাদের সাহায্য করে বন্ধুত্বের পরিচয় দিতে লাগলেন। মারাঠার সে প্রতাপ, সে সাহস, সে রণোন্মাদনা বিগত সময়ের সঙ্গে মিশে গেল। গঙ্গার তীরে বাজীরাও-এর এখন দিন কাটে মালা জপ করে।

বাজীরাও-এর টাকার অভাব ছিলনা।

বিঠুরের জায়গীর থেকে তিনি প্রচুর টাকা পেতেন। তার ওপর কোম্পানীর সরকার থেকে পেতেন বছরে আট লক্ষ টাকা। এতেই তিনি বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হয়েছিলেন। কিন্তু এই ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী কই? বিঠুরের প্রাসাদ খাঁ খাঁ করে একটি ছেলের অভাবে। বাজীরাও অপুত্রক। তাই সকলেই ভাবে, তিনি মারা গেলে কে এই জায়গীর ভোগ করবে, কে এই বিপুল সম্পদ ভোগ করবে? কার হাতে গিয়ে পড়বে এই ঐশ্বর্য? বাজীরাও নিজেও যে এ-কথা ভাবতেন না, তা নয়; কিন্তু উপায় কি? ইংরেজ তাঁর রাজ্য কেড়ে নিল, রাজসম্মান কেড়ে নিল, আর ভগবান তাঁকে পুত্রসুখে বঞ্চিত করলেন। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে তিনি শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। একদিন তাঁর অমাত্য রঘুজী ত্র্যম্বক বাজীরাওকে বললেন—"আপনি অত ভাবছেন কেন?"

—রঘুজী, আমি আর কদিন বাঁচব? আমি মারা গেলে এই জায়গীর কে দেখবে?

—কাউকে দত্তক নিন না?

—দত্তক নিতে পারি, এমন ছেলে কই?

—আপনি অনুমতি করলেই খোঁজ নিতে পারি।

—তাই নাও, রঘুজী।

মাথেরন।

মহারাষ্ট্রের এক প্রান্তে আকাশচুম্বী মাথেরন পাহাড়। পাহাড়ের নীচে মখমলের মত নরম সবুজ উপত্যকা। সেই রমণীয় উপত্যকার কোলে ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম বেণু। সেই বেণুগ্রামে বহু সম্ভ্রান্ত প্রাচীন মারাঠা পরিবারের বাস। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ছিলেন মাধবরাও নারায়ণ ভাট। তাঁর স্ত্রী গঙ্গাবাঈ। খুব পুণ্যবতী। দারিদ্র্যের

মধ্যেও এঁরা দুজনে খুব সুখে ও শান্তিতে ছিলেন। পুণ্যবতী গঙ্গাবাঈ-এর কোলে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের একদিন একটি ছেলের জন্ম হলো। দরিদ্র মাধবরাও-এর মুখে হাসি ফুটে উঠল পুত্রের মুখ দেখে। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ সহজেই বুঝতে পারলেন পুত্রটি ক্ষণজন্মা।

এই পুত্রই নানাসাহেব—যাঁর নামে ইংরেজের বুকে জাগতো আতঙ্ক। স্বাধীনতা এবং দেশের জন্য সংগ্রাম করে যিনি ইতিহাসে আজ অমর হয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহের সেই বীরযোদ্ধা নানাসাহেব সেদিন জন্মেছিলেন এইভাবে এক অখ্যাত অজ্ঞাত দরিদ্র মারাঠা পরিবারে।

নানাসাহেবের জন্মের সময়েই বাজীরাও গদী ছেড়ে বিঠুরে এসে বাস করতে থাকেন। বাজীরাও-এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিচিত অনেক মারাঠা পরিবারও বিঠুরে চলে আসে। বিঠুরে বাজীরাও মারাঠাদের নিয়ে একটা নতুন বসতিস্থাপন করেছেন শুনে অনেক নতুন মারাঠা পরিবারও এখানে আসতে থাকে। এই নতুন দলের মধ্যে ছিলেন বেণুগ্রামের মাধবরাও। ছেলের জন্মের তিন বছর পরেই মাধবরাও সপরিবারে বিঠুরে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন।

রঘুজী একদিন বেড়াতে বেড়াতে মাধবরাও-এর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন বিকেল বেলা। মাধবরাও তাঁর শিশুপুত্রকে নিয়ে সেই সময়ে খেলা করছিলেন। হঠাৎ রঘুজীর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সেই ছেলেটির ওপর। মাধবরাও রঘুজীকে চিনতেন না। রঘুজী পরিচয় দিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁকে অভ্যর্থনা করে গৃহে নিয়ে এলেন। রঘুজী শিশুটিকে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে আদর করলেন। তাঁর মনে হলো পেশবাবংশের উত্তরাধিকারী হবার মত ছেলে বটে, কিন্তু মাধবরাও রাজী হলে হয়। তখনই আর তিনি দত্তকের প্রস্তাব করলেন না। মাধবরাওকে নিমন্ত্রণ করে তিনি ফিরে এলেন। বিদায় নেবার

সময়ে বলে গেলেন—"শুধু একা নয়, ব্রাহ্মণী ও পুত্রটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন।"

পরের দিন। দুপুর বেলা। বাজীরাও রঘুজীর মুখে শুনে অবধি ব্যগ্রভাবে মাধবরাও-এর আসার জন্যে অপেক্ষা করছেন। পাছে দেরী হয়, সেজন্য তিনি পাল্কী পাঠিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পরেই পাল্কী এসে থামল বিঠুর প্রাসাদ তোরণের সামনে। ওপরে অলিন্দে দাঁড়িয়েছিলেন বাজীরাও। গঙ্গাবাঈ যখন ছেলের হাত ধরে নামলেন, তখন কিশোরকান্তি নানাসাহেবকে দেখে বাজীরাও মুগ্ধ হলেন। সুলক্ষণযুক্ত ছেলে বটে! রঘুজী মিথ্যা বলেন নি।

ভেতরে এলে পর বাজীরাও ছেলেকে কোলে নিয়ে আদর করলেন। প্রাসাদের পুরনারীরাও এসে তাকে আদর করলেন। এমন একটি ছেলের অভাবেই বিঠুরের প্রাসাদ আজ শূন্য। শূন্য তাঁরও বুক—ভাবলেন বাজীরাও। সেইদিন থেকে এই প্রাসাদে শিশুর আসা-যাওয়া হয়ে উঠল নিয়মিত। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, বাজীরাও একদিন তাকে না দেখলে থাকতে পারেন না।

তারপর একদিন সুযোগমত রঘুজী মাধবরাও-এর কাছে কথাটা তুললেন।

—পেশবা আপনার ছেলেটিকে দত্তক নিতে চান।

মাধবরাও বা গঙ্গাবাঈ কেউই আপত্তি করলেন না।

তারপর একদিন ভালো দিন দেখে শাস্ত্রবিধিমতে বাজীরাও নানাসাহেবকে দত্তক নিলেন।

॥ তিন ॥

নানাসাহেবকে দত্তক নেবার তিন বছর পরে বাজীরাও পর পর দুটি ছেলের মুখ দেখলেন। ছেলেদের নাম রাখা হলো বালরাও ও বাবাভট্ট। বালরাও ও বাবাভট্ট নানার ছোট-ভাই বলে স্বীকৃত হলেন। প্রাসাদে নানা আরো দুটি সাথী পেয়েছিলেন—পাণ্ডুরং ও সদাশিব। দুজনেই বাজীরাও-এর এক ভাইয়ের ছেলে। সেই থেকে বিঠুরের বিশাল প্রাসাদে এঁরা সকলেই একসঙ্গে মানুষ হতে লাগলেন।

কিছুদিন পরে নানাসাহেবের একটি সঙ্গিনীও এসে জুটলো।

এই সঙ্গিনী লক্ষ্মীবাঈ। সিপাহীবিদ্রোহের নায়িকা—ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ।

কৃষ্ণরাও নামে এক মারাঠি ব্রাহ্মণ ছিলেন। কৃষ্ণরাও বাস করতেন কৃষ্ণা নদীর তীরে পুনার এক ছোট্ট গ্রামে। পেশবাদের অধীনে তিনি কালেক্টরের কাজ করতেন। কৃষ্ণরাও-এর ছেলে বলবন্তরাও পেশবার সরকারে একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়কের কাজ করতেন। তাঁর দুই ছেলের মধ্যে বড়টির নাম মোরোপন্ত তাম্বে। মোরোপন্ত পুনায় থাকতেন তাঁর ঠাকুরদার কাছে। চিমাজী আপ্পা নামে পেশবার এক সহোদর ভাই ছিল। বাজীরাও বিঠুরে চলে গেলে চিমাজী আপ্পা কাশীতে গিয়ে বাস করেন। মোরোপন্তের সঙ্গে চিমাজীর খুব ভাব ছিল। চিমাজী কাশী চলে যাবার পর তাঁর প্রিয় সহচর মোরোপন্তও সপরিবারে কাশী গিয়ে বসবাস করেন। এখানে তিনি চিমাজীর দেওয়ানের কাজ করতেন।

এইখানে যথাসময়ে মোরোপন্ত তাম্বের একটি মেয়ে হয়।

মেয়েটিকে সবাই ডাকত মনুবাঈ বলে। মনুর বয়স যখন তিন-চার বছর, তখন তার মা ভাগীরথীবাঈ মারা গেলেন। এই সময়ে চিমাজীরও মৃত্যু হয়। মোরোপন্ত তখন কাশী ছেড়ে বিঠুরে গিয়ে বাজীরাও-এর আশ্রয় নিলেন। মা-হারা মেয়ে মনুবাঈ ছিলেন তাঁর পিতার স্নেহ ও আদরের পাত্রী। সব সময়েই তিনি বাবার কাছে কাছেই থাকতেন। মোরোপন্তও তাঁর হৃদয়ের অসীম স্নেহ মেয়ের ওপর উজার করে ঢেলে দিয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে মনু বড় হয়ে ওঠে।

তাঁর লাবণ্যময় দেহ, সুন্দর গৌরকান্তি মুখশ্রী আর সরলতা-মাখান আচার-ব্যবহার দেখে সবাই তাকে ডাকে ছবেলি বা ময়না বলে। বাজীরাও-এর অনুচরবর্গ সবাই ময়নাকে ভালবাসে। নানাসাহেব ও রাওসাহেবের সঙ্গে ময়না সব সময়ে খেলা করতেন। বাজীরাও নিজেও মেয়েটিকে খুব স্নেহ করতেন ময়নাও তাঁর কাছে নিঃসংকোচে নানা আবদার করেন বাজীরাও বালিকার আবদার সহজেই পূর্ণ করতেন। নানা সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বেরুতেন, তখন তাঁর পাশে পাশে মনুবাঈও চলতেন ঘোড়ায় চড়ে। নানাসাহেব যখন তরবারী নিয়ে খেলা করতেন, তাঁর দেখাদেখি মনুও তরবারী হাতে নিয়ে খেলতেন। নানাসাহেব যখন হাতীর পিঠে হাওদায় গিয়ে বসতেন, তখন মনু বলতেন: "ভাই, আমাকে তোমার সঙ্গে নেবে না"? অমনি নানাসাহেব তাঁকে হাওদায় তুলে নিতেন।

এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই দুজনে দুজনকে খুব ভালো-বাসতেন। এমনি করেই ইতিহাসের এই দুটি ভাইবোন শৈশবে এক সঙ্গে মানুষ হয়েছিলেন। প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিনে ছবেলি সোনার থালায় করে দুর্বাচন্দন সাজিয়ে একহাতে প্রদীপ নিয়ে নানাসাহেবের মঙ্গল কামনা করতেন। বিঠুর প্রাসাদে এই দৃশ্য যে একবার দেখত সেই-ই মুগ্ধ হতো।

নানাসাহেব বড় হয়ে উঠলেন।

বাজীরাও কোম্পানীর সরকারের কাছে আবেদন করলেন : "আমি ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবকে যথাবিধি দত্তক নিয়েছি। আমার এই দত্তক পুত্রকে পেশবা উপাধিতে ভূষিত করতে চাই এবং আমি এখন বছরে আট লাখ টাকা করে যে বৃত্তি পেয়ে থাকি, আমি মারা যাবার পর সেই বৃত্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন তাকে দেন।"

আবেদন অগ্রাহ্য হলো।

গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে জবাব এলো : "পেশবা মারা গেলে পরে তাঁরা বিবেচনা করে তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন। নানাসাহেবকে পেশবা উপাধি দেওয়াতে গভর্ণমেণ্টের বিলক্ষণ আপত্তি আছে ; কারণ গভর্ণমেণ্ট এই দত্তক-গ্রহণ সিদ্ধ বলে স্বীকার করেন না।" বাজীরাও-এর আশা বিলুপ্ত হলো। বন্ধুত্বের এই পুরস্কার !

একদিন দরবারে নানাসাহেবকে ডেকে বৃদ্ধ বাজীরাও বললেন : "কোম্পানী তো আমার কথা রাখলে না। তোমাকে পেশবা বলে স্বীকার করতে তারা নারাজ। এমন কি, সরকার থেকে আমি বছরে আট লাখ টাকা করে যে-বৃত্তি পাই, সেটাও আমার মৃত্যুর পর তুমি পাবে কিনা সন্দেহ।"

—"ইংরেজ আপনার গদী কেড়ে নিয়েছে, তবু তাদের বিপদে-আপদে আপনি বন্ধুর মতো তাদের সাহায্য করেছেন। সেই বন্ধুত্বের সম্মানও যারা রাখল না, তাদের সঙ্গে নানা-সাহেব কোনোদিনই বন্ধুর মত আচরণ করতে পারবে না।"

সাতাশ বছরের ছেলের মুখে এই রকম নির্ভীক কথা শুনে বাজীরাও বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের উৎসাহ বোধ করলেন। পেশবা বংশের যোগ্য দত্তক-ই তিনি পেয়েছেন,—ভাবলেন তিনি মনে মনে। তবু তিনি বললেন : "এ-বিষয়ে তুমি রামচন্দ্রের পরামর্শ মতো কাজ করো।"

ক্রমে বাজীরাও-এর পরমায়ু ফুরিয়ে এল। সাতাত্তর বছর বয়সে একদিন তিনি মারা গেলেন। বাজীরাও-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন নানাসাহেবের বয়স সাতাশ বছর। তাঁর মৃত্যুর দুবছর পরেই ভারতবর্ষে দেখা দিল এক প্রলয়ঙ্কর ঘটনা। সেই ঘটনার পুরোভাগে ছিলেন নানাসাহেব।

বাজীরাও-এর মৃত্যুর পরে নানাসাহেব বসলেন পেশবার গদীতে, বিঠুরের জায়গীরের তিনিই হলেন মালিক। বাজীরাও তাঁকে খুব যত্নের সঙ্গে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। উর্দু, ফার্সী ও হিন্দি ছাড়া, একজন ইংরেজের কাছে নানাসাহেব ইংরেজীও ভালো শিখেছিলেন। তিনি প্রত্যহ খবরের কাগজ পড়তেন। তাঁর স্বভাব ছিল শান্ত। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। কোন রকম অমিতাচার তাঁর চরিত্রকে কলঙ্কিত করেনি। বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তিনি কিছুকাল ইংরেজের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেই চলেছিলেন। সব সময়েই তিনি কমিশনারের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

নানাসাহেব এখন প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিকারী। কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের প্রমাণ হিসেবে তিনি পনর লাখ টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাগজ কিনলেন। বিঠুর প্রাসাদে বাজীরাও-এর ছিল অনেকগুলি পোষ্য, অসংখ্য দাসদাসী ও অনুচর আর ছিল কিছু সৈন্য। তাঁর মৃত্যুর পরে এদের ভরণপোষণের ভার পড়ল নানাসাহেবের ওপর।

বাজীরাও বছরে যে আট লাখ টাকা করে বৃত্তি পেতেন, তিনি মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট সেই বৃত্তি বন্ধ করে দিলেন। নানাসাহেব তখন রামচন্দ্র পন্থের কাছে উপদেশ চাইলেন। এই রামচন্দ্র পন্থ ছিলেন বাজীরাও-এর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং তাঁরই ওপর ছিল বিঠুর প্রাসাদের পরিজনবর্গের দেখাশুনা করবার ভার। তিনি আজীবন পেশবার হিতাকাংক্ষী বন্ধু। পেশবারও ছিল অগাধ বিশ্বাস তাঁর

ওপর। মৃত্যুকালে পিতা যা বলে গিয়েছেন, নানাসাহেব সে-কথা ভোলেন নি।

একদিন নানাসাহেব রামচন্দ্রকে বললেন: "গভর্ণমেণ্ট তো বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছে, অথচ বিঠুর দরবার ও প্রাসাদের খরচ কম নয়। এখন কি করা উচিত?"

উত্তরে রামচন্দ্র বললেন: "গভর্ণমেণ্টের কাছে আমি তোমার হয়ে চিঠি লিখব।"

—তাতে কোন ফল হবে মনে করেন?

—ন্যায়ের দোহাই দিয়ে সুবিচার চাইব।

—যদি কোম্পানী আপনার অনুরোধ না শোনে, তখন?

—আগে অনুরোধ তো করি, পরের কথা পরে।

নানাসাহেব আর তর্ক করলেন না।

রামচন্দ্র অনেক সৌজন্য ও সম্মান দেখিয়ে গভর্ণমেণ্টের কাছে লিখলেন: "কোম্পানীর ন্যায় বিচারের ওপর নানা-সাহেবের অগাধ বিশ্বাস। মহামান্য কোম্পানী যে-ভাবে ভূতপূর্ব মহারাজের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, তাঁর পুত্র নানাসাহেবও কোম্পানীর কাছ থেকে সেই রকম ব্যবহারই আশা করেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের দয়া ও উদারতার ওপর বর্তমান পেশবার খুব ভরসা আছে।"

মারল্যাণ্ড সাহেব তখন বিঠুরের কমিশনার। তিনি এই আবেদন পত্র সমর্থন করে পাঠিয়ে দিলেন গভর্ণর-জেনারেলের কাছে। লর্ড ডালহৌসি সেই সময়ে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল। এই আবেদনের জবাবে তিনি লিখলেন: "পেশবা তেতাল্লিশ বছর যাবৎ বছরে আট লাখ টাকা করে বৃত্তি ভোগ করেছেন, এ ছাড়া জায়গীরের উপস্বত্ব ছিল। তার থেকে তিনি কম করে আড়াই কোটি টাকা পেয়েছেন। কমিশনারের রিপোর্ট থেকেও আমি জানতে পেরেছি যে পেশবার মৃত্যুর পর নানাসাহেব তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি যা লাভ করেছেন, তার পরিমাণও নেহাৎ

কোম্পানীর সিপাহী

(শতবর্ষ পূর্বের অঙ্কিত একটি চিত্র হইতে)

কম নয়। দেখা যায় যে, তিনি ষোল লাখ টাকার কোম্পানীর কাগজ, দশ লাখ টাকার মণিমুক্তা, তিন লাখ টাকার মোহর, আশী হাজার টাকার সোনার গহনা এবং বিশ হাজার টাকার রূপার বাসনপত্র পেয়েছেন। এ ছাড়া পেশবা মৃত্যুকালে তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের জন্য আটাশ লাখ টাকা রেখে গিয়েছেন। এখন পেশবার যে সব আত্মীয়স্বজন বর্তমান আছেন, গভর্ণমেণ্টের বিবেচনা অনুসারে তাঁদের কোন রকম দাবী নেই। গভর্ণমেণ্টের দয়ার ওপরেও এ সময়ে তাঁরা কোন রকম দাবী-দাওয়া আনতে পারেন না। কারণ পেশবা যে সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, তাই-ই তাঁদের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট।"

রামচন্দ্র যখন নানাসাহেবকে ডালসৌসির এই জবাব পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন রাগে নানাসাহেবের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল। তাহলে আবেদন বিফল হলো! আজীবন আমি পৈতৃক বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হলাম! চকিতে মনে পড়ল বাজীরাও-এর কথা। তিনি তো ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে আর ইংরেজের বন্ধুত্বের ওপর বিশ্বাস করেই দত্তকপুত্র নিয়েছিলেন। যে বাজীরাও কাবুল ও পাঞ্জাব যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ কোম্পানীকে টাকা দিয়ে, সৈন্য দিয়ে সাহায্য করলেন, বন্ধুত্বের গৌরব রক্ষা করলেন, সেই বৃটিশ কোম্পানী কি-না তাঁরই ছেলেকে বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করে সেই বন্ধুত্বের গৌরব নষ্ট করলেন! নানা-সাহেব রামচন্দ্রকে বললেন: "আপনি একবার ভেবে দেখুন এ কত বড় অন্যায়।"

—অন্যায় বৈকি! গভর্ণমেণ্ট তো পেশবাকে কথা দিয়ে-ছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বৃত্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করবেন।

—এই তো কোম্পানীর বিবেচনা দেখতে পাচ্ছি। আমি বিলেতে আপিল করব।

যথাসময়ে কমিশনার মারফৎ বিঠুরে ডালহৌসির মতানুসারে গভর্ণমেণ্টের এক আদেশ ঘোষিত হলো। ঘোষণায় বলা

হলো : "নানাসাহেবের বৃত্তি এখন থেকে বন্ধ হলো। তবে বিঠুরের জায়গীরে কোম্পানী হাত দেবেন না ; কিন্তু পেশবার সময়ে ঐ জায়গীরের অধিবাসীরা যে নিয়মে আবদ্ধ ছিল, এখন থেকে সেই নিয়ম আর রইল না। গভর্ণমেণ্ট ১৮৩২-এর ব্যবস্থা রহিত করে বিঠুরের অধিবাসীদের দেওয়ানী ও ফৌজদারী শাসনের অধীন করলেন।"

নানাসাহেব রামচন্দ্রকে বললেন : "১৮৩২-এর ব্যবস্থা রহিত হওয়ার মানে বিঠুরের স্বাধীনতা লোপ। এ আমি কিছুতেই সহ্য করব না। আপনি ইংলণ্ডে ডিরেক্টর সভায় পাঠাবার জন্যে আবেদনপত্র তৈরী করুন।"

নানাসাহেব বিলেতে আপিল করবেন শুনে কমিশনার একদিন প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। উদ্দেশ্য নানাসাহেবকে নিরস্ত করা। তিনি নানাসাহেবকে বোঝালেন যে, এর আগে পেশবাও একবার আপিল করতে চেয়েছিলেন বটে তবে শেষে তিনি তাঁর কথায় নিরস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নানাসাহেব অন্য ধাতুতে তৈরী। তিনি কমিশনারের কথায় কান দিলেন না। আপিল করতেই হবে।

রামচন্দ্র পন্থ নানাসাহেবের কথামত আপিল তৈরী করতে আরম্ভ করলেন। এ-কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত। তিন দিন তিন রাত্রি ধরে রামচন্দ্র আপিল তৈরী করলেন। আপিলের ভাষা ও যুক্তির বহর দেখে নানাসাহেব খুশি হলেন। বললেন—"এইটাই বিলেতে পাঠিয়ে দিন।"

—বিলেতে সরাসরি আমরা পাঠাতে পারি না।

—তবে ?

—আমরা পাঠাব গভর্ণর-জেনারেলের কাছে ; তিনি পাঠাবেন বিলেতে—এই-ই নিয়ম।

যথাসময়ে নানাসাহেবের আপিল লণ্ডনে ডিরেক্টরদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো।

॥ চার ॥

বিলেতে আপিল গেল।

সেই ঐতিহাসিক আপিলে নানাসাহেব লিখলেন: "মৃত পেশবার অনেকগুলি পরিবারের জীবন নির্ভর করছে বৃটিশ কোম্পানীর প্রতিশ্রুতির ওপর। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট এঁদের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, তার মধ্যে সমবেদনা দূরে থাক, তা একটা প্রাচীন রাজবংশের প্রতিনিধির প্রাপ্য স্বত্বেরও বিরোধী। সেই জন্য আমি কেবল সন্ধির ওপর নির্ভর করে আপনাদের কাছে সুবিচার চাইছি না। বৃটিশ কোম্পানী মহারাষ্ট্রের শেষ অধিপতির কাছ থেকে যে কিছু উপকার পেয়েছেন, কিছুটা তারই ওপর নির্ভর করে আমি এই আপিল করছি।

"আমার যুক্তি এই যে প্রথমতঃ পেশবা যখন তাঁর উত্তরাধিকারিদের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর রাজ্য বৃটিশ কোম্পানীর কাছে বিক্রী করেছেন, তখন কোম্পানী পেশবা ও তাঁর উত্তরাধিকারিদিগকে তার ন্যায্য মূল্য দিতে অবশ্যই বাধ্য। নিয়ম এক তরফা হতে পারে না।

"দ্বিতীয়তঃ সন্ধিপত্রে একটি কথা আছে 'পরিবার'। এই কথাটি বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারীর পরিচায়ক। কাজেই কোম্পানী যে সন্ধিপত্র অনুসারে পেশবার রাজ্য নিয়ে তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য যে-বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন, সেই বৃত্তি বংশ পরম্পরায় তাঁর উত্তরাধিকারীরা অবশ্যই পেতে পারেন।

"তারপর আমি নজীর দেখিয়ে বলতে পারি যে, কোম্পানী আর সব রাজবংশের সঙ্গে পেশবার পরিবারবর্গের যে রকম ইতরবিশেষ করেছেন, তা মনে হলে হতবুদ্ধি হতে

হয়। মহীশূর ও দিল্লীর সম্রাটের সঙ্গে কোম্পানী যেরকম ব্যবহার করেছেন, পেশবার সঙ্গে কি ঠিক সেইরকম ব্যবহার করছেন? কোম্পানী এঁদের সঙ্গে বরং সদয় ব্যবহার করেছেন। দিল্লীর সম্রাটের বংশধরেরা এখনো রাজচিহ্ন ও বৃত্তি দুই-ই ভোগ করছেন। কিন্তু আমার বেলায় পৃথক ব্যবস্থা কেন?

"পেশবা কোম্পানীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন সত্য এবং তার ফলে তাঁর নিজের সিংহাসন বিপদাপন্ন হয়েছিল; কিন্তু সন্ধি করার পর তিনি তো কোম্পানীর সমস্ত প্রস্তাবই মেনে নিয়েছিলেন। পেশবা যখন নিজেকে এবং নিজের পরিবারদের দায়ীত্ব কোম্পানীর সুবিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলেন, তাঁর বহুমূল্য রাজত্ব কোম্পানীর হাতে তুলে দিলেন, তখন কোন্ নিয়ম অনুসারে সেই সন্ধির সর্ত্ত ও রাজচিহ্ন লোপ করে দিয়ে তাঁর বংশধরদের পেন্সন থেকে বঞ্চিত করা হলো?

"তারপর দত্তকের কথা। পেশবা আমাকে যথাবিধি দত্তক নিয়েছেন। কোম্পানী দত্তকপুত্রের বৈধতা স্বীকার করতে বাধ্য। পেশবা নিজের পেন্সন বাঁচিয়ে অনেক সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, কাজেই তাঁর উত্তরাধিকারীকে কোন রকম পেন্সন দেওয়া হবে না—কোম্পানীর এই আপত্তির মধ্যে এতটুকু যুক্তি নেই। ভূতপূর্ব পেশবা তাঁর পেন্সন থেকে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য অনেক টাকা রেখে গিয়েছেন—কোম্পানীর এমন কথা মনে করাই অন্যায়। সন্ধিতে স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট পেশবা ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য বছরে আট লাখ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত। পেশবা ঐ বৃত্তির কতটা খরচ করলেন, আর কতটা বাঁচালেন, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের তা খোঁজ নেবার দরকার আছে কি?

"সন্ধিতে এমন কথা ছিল না যে, পেশবা তাঁর পেন্সনের সব টাকাই খরচ করবেন। কাজেই আমি সাহসের সঙ্গে জিজ্ঞাসা

করছি, কোম্পানীর যে সব বৃত্তিভোগী কর্মচারী আছেন, তাঁদের পেন্সনের টাকা তাঁরা কিভাবে খরচ করেন কিম্বা তার থেকে কত টাকা তাঁরা জমান, তা কি গভর্ণমেণ্ট জিজ্ঞাসা করতে পারেন? পেশবা একজন প্রাচীন রাজবংশধর; তিনি গভর্ণমেণ্টের ন্যায়-পরতার ওপর নির্ভর করেছিলেন এ-ক্ষেত্রে গভর্ণমেণ্টের কি উচিত তাঁর বংশধরের সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করা?

"আমি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন ১৮১৮-এর সন্ধিপত্রখানা আর একবার ভালো করে পড়ে দেখেন। সেই সন্ধির ভাষার মধ্যে যদি কোন কারচুপি না থাকে, তাহলে সেই সন্ধির সরল অর্থ এই দাঁড়ায়—কেবলমাত্র পেশবা ও তাঁর পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য বছরে আট লাখ টাকা বৃত্তি ঠিক করা হয় নি, যে সব বিশ্বস্ত অনুচর বিঠুরে পেশবার অনুগামী হয়, তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যও ঐ বৃত্তি ঠিক করা হয়েছিল। চৌত্রিশ লক্ষ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তির বদলে পেশবা পেয়েছিলেন মাত্র আট লক্ষ টাকার বৃত্তি। এই টাকা থেকে নিজের মানসম্ভ্রম বজায় রেখে তিনি যা বাঁচিয়েছেন, তার পরিমাণ সামান্যই। তাহলে এখন কি জন্যে গভর্ণমেণ্ট তাঁর পরিবারবর্গকে সন্ধি-নির্দিষ্ট বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন?"

নানাসাহেবের আপিলের তীক্ষ্ণ যুক্তি ও লিপি-কৌশল দেখে বিলেতে কোম্পানীর ডিরেক্টররা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু কোন সুফল হলো না। তাঁরা এতটুকু টললেন না, ধুন্ধুপন্থের প্রার্থনায় তাঁদের হৃদয় কোমল হলো না। তাঁরা ডালহৌসির মত-ই বজায় রাখলেন। যথাসময়ে লণ্ডন থেকে জবাব এল—না।

ডিরেক্টরসভা নানাসাহেবকে লিখলেন: "আমরা সম্পূর্ণরূপে গভর্ণর জেনারেলের নিষ্পত্তির অনুমোদন করে নির্দেশ করছি যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ওপর বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র বা পোষ্যদের

কোনো দাবী নেই। ভূতপূর্ব পেশবা তেত্রিশ বছর কাল ধরে পেন্সন পেয়ে যে সব সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন, তাতেই তাঁর পরিবার ও পোষ্যদের চলতে পারবে।"

নানাসাহেব নিরস্ত হলেন না। আবার ডিরেক্টরসভার কাছে তিনি আবেদন করলেন। আগের মতই জবাব এল—"না। নানাসাহেবকে যেন জানান হয় যে, তাঁর পিতার বৃত্তি পুরুষানুক্রমিক নয়, সুতরাং তাতে তাঁর কোনো দাবী নেই। তাঁর আবেদনপত্র সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করা হলো।"

বিঠুরের কমিশনার যেদিন এই কঠোর উত্তর নিজের হাতে এনে বিঠুরের দরবারে নানাসাহেবের হাতে দিলেন, তখন নানাসাহেব কিন্তু তাঁর রাগ বা ক্ষোভ কথায় প্রকাশ করলেন না।

শিষ্টাচারের সঙ্গেই তিনি কমিশনারকে দরবারে অভ্যর্থনা করলেন এবং নিঃশব্দে তাঁর হাত থেকে ডিরেক্টরদের উত্তর গ্রহণ করলেন।

—আমি আপনার জন্যে খুব দুঃখিত, নানাসাহেব : বললেন কমিশনার।

—আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই : অবিচলিত ভাবে বললেন রামচন্দ্র পন্থ।

নানাসাহেব তখন আজিমউল্লার সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

সুগঠিত, সুশ্রী, দীর্ঘকায় এই মুসলমান যুবক নানার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও ফারসী ভাষা খুব ভালো জানতেন। বুদ্ধিমান ও সুচতুর আজিমউল্লা কানপুরের এক সাধারণ মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি মাদ্রাসায় সামান্য লেখাপড়া শেখেন।

ভাগ্য তাঁকে নিয়ে এল এক ইংরেজের সংস্পর্শে। তিনি তারই কাছে সামান্য একটা খানসামার চাকরী নিলেন—

টেবিলে খানা যোগাবার কাজ। তাঁর মনিব দেখলেন ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান। তাকে তিনি যত্নের সঙ্গে ইংরেজি ও ফারসী শেখালেন। তার পর কানপুরের একটা সরকারী স্কুলে আজিমউল্লা ভর্তি হলেন। সেখান থেকে ভালো করে পাশ করে সেই স্কুলে তিনি মাস্টারী করতে লাগলেন। নানাসাহেবের সঙ্গে আজিমউল্লার এই সময়েই আলাপ হয়। তিনি আজিমউল্লাকে বিঠুর দরবারে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতার স্থান দিলেন।

যেদিন বিলেতের ডিরেক্টরসভার শেষ সিদ্ধান্ত বিঠুরের কমিশনার নানাসাহেবকে জানিয়ে গেলেন, সেই দিনই সন্ধ্যা-বেলায় দরবারে বসে নানাসাহেব আজিমউল্লার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। নানাসাহেব বললেন ঃ "সবই তো শুনেছ, আজিম। এখন আমাদের কি করা কর্তব্য ?"

—আমি তো ভেবেছিলাম এমন যুক্তি-তর্ক ও ইতিহাসের নজীর দেখিয়ে আবেদন করলে, এর ফল নিশ্চয়ই ভালো হবে। কিন্তু এখন দেখছি, কোম্পানী মুখে বলে এক, কাজে করে আর এক ঃ বললেন আজিমউল্লা।

দরবার ঘরে দেওয়ালে টানানো ছিল বাজীরাও-এর ছবি। ঝাড় লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলো এসে পড়েছে বাজীরাও-এর মুখের ওপর। সেইদিকে তাকিয়ে নানাসাহেব বললেন ঃ "তাইতো দেখছি। ইংরেজের বন্ধুত্বের ওপর পেশবার অগাধ বিশ্বাস ছিল। তুমি তো জানো, বিঠুরে আসার পর থেকে তিনি বারবারই কোম্পানীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে এসেছেন। কাবুল-যুদ্ধে টাকার অভাবে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ত্রাহি ত্রাহি ডাক ওঠে, তখন এই রাজ্যহারা বাজীরাও পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে সাহায্য করলেন; পাঞ্জাবে খালসা শিখ যখন প্রবল হুঙ্কারে কোম্পানীর রাজ্য অধিকার করতে এগিয়ে এল, তখন এই বাজীরাও-ই নিজের খরচে এক হাজার

অশ্বারোহী ও এক হাজার পদাতিক দিয়ে কোম্পানীকে বাঁচিয়েছিলেন।"

—আর সেই বাজীরাও-এর ছেলে কোম্পানীর কাছে পেশবার বৃত্তি পাবার জন্যে আবেদন-নিবেদন ও দরবার করে বিফল হলো। ডালহৌসি তোমার বৃত্তি বন্ধ করলেন, বিলেতে ডিরেক্টররাও তোমার আপিলে কর্ণপাত করলেন না।

—আমি শুধু ভাবছি আজিম, এই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবহার। কৃতজ্ঞতা বলে কি কোনো জিনিস নেই?

—কৃতজ্ঞতা? যারা এদেশে দাঁড়িপাল্লা হাতে করে বাণিজ্য করতে এসে দেশের মালিক হয়ে বসেছে, যাদের সর্বগ্রাসী ক্ষুধার কাছে ভারতের কত রাজ্য চলে গেল, সেই বণিকজাতের কাছে তুমি কৃতজ্ঞতার আশা কর, বন্ধু?

—যাইহোক, এখন উপায় কি বলো?

—আমি তো কোন উপায় দেখছি না।

—তুমি একবার যাবে ইংলণ্ডে? সেখানে গিয়ে আমার হয়ে আপিল করবে?

—তুমি যদি বলো, নিশ্চয়ই যাব।

তারপর ১৮৫৩ অব্দের জুন মাসে আজিমউল্লা নানাসাহেবের দূত হয়ে ইংলণ্ডে গেলেন আপিল করবার জন্য। বিডন্‌সাহেব নামে একজন ইংরেজের সাহায্যে আজিমউল্লা নানাসাহেবের হয়ে ডিরেক্টরসভায় আবেদন পেশ করলেন। তীক্ষ্ণ যুক্তিজাল বিস্তার করে তিনি নানাসাহেবের বক্তব্য ইংলণ্ডের দরবারে তুললেন। কিন্তু বণিক কোম্পানীর স্বার্থের কাছে যাঁদের মাথা বিকিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের আগেকার সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন। আজিমউল্লা কৃতকার্য হতে পারলেন না। তাঁর উদ্যোগ, কৌশল ও চেষ্টা সবই ব্যর্থ হলো।

আজিমউল্লা যখন ইংলণ্ডে নানার দূত হয়ে গিয়েছেন, তখন সেতারা রাজ্যের দূত হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন আর একজন

মারাঠা। তাঁর নাম রঙ্গ বাপাজী। কর্তব্যনিষ্ঠ, স্থিরবুদ্ধি রঙ্গ বাপাজীও বিশেষ উত্যোগ, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেতারা রাজের পক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এই উত্যোগ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সফল হলো না। আজিমউল্লা ও রঙ্গ বাপাজী তুজনেই ব্যর্থ মনোরথ হয়ে এই দূরদেশেই পরস্পর পরস্পরের সহিত একতাসূত্রে আবদ্ধ হলেন। ব্যর্থ দৌত্যের নৈরাশ্য নিয়ে আজিমউল্লা কিছুদিন পরে দেশে ফিরলেন।

বৃত্তি বন্ধ হলো। উপাধি থেকে বঞ্চিত হলেন। একটা গভীর বেদনা নানাসাহেবের মনে দাগ কেটে গেল। কোম্পানীর অবিচার নানাসাহেবকে কোম্পানীর প্রতি বিরূপ করে তুললো। কিন্তু বুদ্ধিমান নানাসাহেব হৃদয়ের অসন্তোষ মুখে প্রকাশ করলেন না। তিনি তখন তাঁর বিশ্বস্ত পার্শ্বচর তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে পরামর্শ করলেন।

তাঁতিয়া তোপি মারাঠা ব্রাহ্মণ। আহাম্মদনগরে এঁর জন্ম হয়। বয়সে ইনি নানাসাহেবের চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। প্রতিপালক প্রভুর প্রতি ছিল তাঁর অপরীসীম শ্রদ্ধা। তাঁতিয়ার উন্নত দেহ, প্রকাণ্ড মস্তক, চওড়া ললাট, প্রতিভাব্যঞ্জক মুখশ্রী বীরত্বের পরিচয় বহন করতো। সকলের ওপর এই মারাঠা ব্রাহ্মণের রণপাণ্ডিত্য নানাসাহেবকে আকৃষ্ট করেছিল। বিঠুরের সৈন্যবাহিনীর তিনি ছিলেন অধিনায়ক। তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে নানাসাহেব যখন পরামর্শ করলেন তখন সেই মারাঠা-বীর বললেন: "ইংরেজকে বাধ্য করা যায় শুধু একটি উপায়ে। একমাত্র অস্ত্রের যুক্তি ছাড়া অন্য পথ নেই। তবে সুযোগের জন্য আমাদের এখনো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।"

এই কথা শুনে নানাসাহেব আপাততঃ নিশ্চিন্ত হলেন। অস্ত্রের যুক্তি—কথাটা মন্দ নয়, ভাবলেন বিঠুরের নবীন পেশবা।

॥ পাঁচ ॥

নানাসাহেব যখন কোম্পানীর দরবারে বৃত্তি আর পদবীর জন্যে আবেদন-নিবেদন করে ব্যর্থ হলেন, ঠিক সেই সময়ে ঝাঁসীর ওপরে লোলুপ দৃষ্টি পড়ল লর্ড ডালহৌসির। ঝাঁসী বুন্দেলখণ্ডের মধ্যে একটা ছোট্ট রাজ্য। ঝাঁসীর রাজা তখন গঙ্গাধর রাও। এঁরই সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ-এর বিয়ে হয়।

আগেই বলেছি, ছেলেবেলায় লক্ষ্মীবাঈ বিঠুরে ছিলেন। একদা এক জ্যোতিষী মনুর ঠিকুজী দেখে বললেন যে, তিনি রাজরাণী হবেন। মোরোপন্ত জোতিষীর কথায় বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু এরই মধ্যে অতটুকু মেয়ের নাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। নানাসাহেবের সঙ্গে মনু তলোয়ার খেলতেন, ঘোড়ায় চড়তেন, নানারকম পুরুষালি খেলা করতেন। লেখা পড়াতেও তাঁর তেমনি আগ্রহ। সকলের ওপর ছিল তাঁর রূপ-লাবণ্য। মোরোপন্ত এরই মধ্যে কত জায়গায় মেয়ের জন্যে যোগ্য পাত্রের খোঁজ করেছেন, কিন্তু সফল মনোরথ হননি। তাই এখন জ্যোতিষীর মুখে মেয়ে রাজরাণী হবে শুনে মোরোপন্ত খুব বেশী উৎসাহ বোধ করলেন না। কিন্তু জ্যোতিষী খুব জোরের সঙ্গে যখন বললেন: "আমার গণনা অভ্রান্ত!" তখন মোরোপন্তের মনের মধ্যে একটু আশার সঞ্চার হলো। এমন সময়ে বিঠুরে খবর এলো ঝাঁসীর রাজা গঙ্গাধর রাও-এর স্ত্রী মারা গেছেন। জ্যোতিষী তখন মোরোপন্তকে বললেন: "আপনি ঐখানে মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করুন।"

কিন্তু তাঁকে চেনে কে? বাজীরাও-এর কাছে কথাটা তুললেন মোরোপন্ত। সব শুনে বাজীরাও বললেন: "বেশ কথা, আমি গঙ্গাধর রাওকে অনুরোধ করে চিঠি দিচ্ছি।" যথাসময়ে

মোরোপন্ত বাজীরাও-এর চিঠি ঝাঁসীর রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। গঙ্গাধর রাও মেয়ে দেখবার জন্যে একজন মন্ত্রী পাঠালেন বিঠুরে। মন্ত্রী ফিরে এসে সেই পাত্রীর রূপলাবণ্য ও গুণগৌরবের যে সকল বিবরণ দিলেন তা শুনে, গঙ্গাধর রাও বাজীরাও-এর কথায় রাজী হলেন। ১৮৪২ অব্দের বৈশাখ মাসে খুব ধুমধামের সঙ্গে ঝাঁসীর মহারাজার সঙ্গে আট বছরের মনুবাঈ-এর বিয়ে হয়ে গেল। জ্যোতিষী নিজের গণনা সফল হলো দেখে, খুব খুশি হলেন। মোরোপন্ত এত বড় রাজবংশে মেয়ের বিয়ে দিতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। এ সৌভাগ্য যে দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রত্যাশার বাইরে!

বিয়ের সময়ে পুরুতঠাকুর যখন গঙ্গাধর রাও-এর কাপড়ের সঙ্গে মনুর গাঁটছড়া বেঁধে দিচ্ছিলেন, আট বছরের বালিকা তখন তাঁকে বললেন: "ভালো করে শক্ত করে গাঁটছড়া বাঁধুন।" পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিশোর নানা। ছেলেবেলার সাথীর মুখে এই অদ্ভুত কথা শুনে তাঁর মনটা খুশিতে ভরে গিয়েছিল। যিনি একদিন তেজস্বিতার সঙ্গে "মেরি ঝাঁসী দিউঙ্গী নেহি" বলে ইংরেজ রাজপুরুষের বিস্ময় জন্মিয়েছিলেন, আট বছর বয়সেই তাঁর এইরকম কথা বলার ধরণ দেখা দিয়েছিল।

বিয়ে হয়ে গেল।

মনুবাঈ বিঠুর ছেড়ে ঝাঁসিতে এলেন। বিদায় নেবার সময়ে শৈশবের সাথী ধুন্ধুপন্থকে তিনি বললেন: "আমাকে যেন ভুলে যেও না।" নতুন বৌ রাজবাড়িতে প্রবেশ করলেন। মারাঠাদের নিয়ম অনুসারে শ্বশুরবাড়িতে বৌ-এর নতুন নাম রাখা হয়। মনুর আশ্চর্য রূপ দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। সে-রূপ আবার নানা অলঙ্কারে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এই দিব্যকান্তি দেখে পুরবাসীদের আনন্দের সীমা রইল না। যেন মূর্তিমতী লক্ষ্মী। নববধূর নাম রাখা হলো লক্ষ্মীবাঈ। মোরোপন্তের

মনুবাঈ, বিঠুরের ছবেলি, এখন থেকে হলেন লক্ষ্মীবাঈ। বিয়ের পর মোরোপন্ত ঝাঁসীর দরবারে সর্দার হলেন।

বিয়ের বার বছর পরে লক্ষ্মীবাঈ একটি পুত্র প্রসব করলেন।

নবকুমার লাভ করে গঙ্গাধর রাও খুব আনন্দিত হলেন। নগরে মহোৎসবের অনুষ্ঠান হলো। কিন্তু তিন মাস পুরো হতে না হতেই রাজকুমারের অকাল মৃত্যু রাজপুরীতে বিষাদের ছায়াপাত করল। রাজ্য হলো নিরানন্দ। ছেলের শোকে রাণী হলেন কাতর। আর গঙ্গাধর রাও এমন আঘাত পেলেন যে, তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে গেল। অনেক চিকিৎসা হলো, কিন্তু তিনি আর সেরে উঠলেন না। দুরন্ত রোগ অবশেষে তাঁর দুঃসহ শোকের শান্তি করল। মারা যাবার আগে গঙ্গাধর, যথানিয়মে একটা দত্তক গ্রহণ করেন। এই দত্তক পুত্রের নাম দামোদর রাও। ইংরেজ প্রতিনিধির সামনেই গঙ্গাধর এই দত্তক গ্রহণ করলেন।

দত্তক নেবার সময়ে মহারাজা ইংরেজ প্রতিনিধিকে লিখলেন: "আমি এখন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছি। আমার পূর্বপুরুষদের নাম বিলুপ্ত হবে ভেবে, আমার খুব কষ্ট বোধ হচ্ছে। আমি এই জন্যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আমাদের যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধি অনুসারে, আমি আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছি। ঈশ্বরের কৃপায় যদি আমার অসুখ সারে এবং তারপর যদি আমার আর পুত্র-সন্তান জন্মে, তাহলে আমি এ বিষয়ে যা করবার ঠিক তাই করব। আর যদি আমি বেঁচে না থাকি,তাহলে আমার অনুরোধ—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন এই দত্তক পুত্রের প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে বালকের মাতা, আমার বিধবা স্ত্রীকে আজীবন সমস্ত বিষয়ের অধিকার প্রদান করেন। তাঁর প্রতি যেন কখনো কোনো রকম অসদ্ব্যবহার দেখান না হয়।"

গঙ্গাধরের চিঠিতে যে-সন্ধির কথা বলা হয়েছে, সেই সন্ধি

হয়েছিল ১৮১৭ অব্দে। রামচন্দ্র রাও তখন ঝাঁসীর রাজা। বুন্দেলখণ্ডের রাজ্যগুলো কোম্পানীর করায়ত্ত হবার পরেই এই সন্ধি হয়েছিল। এই সন্ধিতে রামচন্দ্র ও তাঁর উত্তরাধিকারিরা পুরুষানুক্রমে ঝাঁসীর স্বত্বাধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

এই সন্ধির পর থেকে রামচন্দ্র বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতি যাবজ্জীবন সৌজন্য ও বন্ধুত্ব দেখিয়ে আসছিলেন। সন্ধির আট বছর পরে ইংরেজ যখন ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন নানাপণ্ডিত নামে মধ্যভারতের একজন সর্দার কাল্পী নগর অবরোধ করতে উদ্যত হন। এই বিপদের সময়ে ঝাঁসীরাজ বন্ধুর মতো বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপকার করেন এবং বহু সৈন্য ও কামান পাঠিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে কাল্পী রক্ষা করেন।

এই বন্ধুত্বের আচরণে কৃতজ্ঞ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট খুশি হয়ে ঝাঁসীর দরবারে রামচন্দ্র রাওকে 'মহারাজা' উপাধি দেন এবং ছত্র, চামর প্রভৃতি রাজলক্ষণের জিনিস দিয়ে তাঁর গৌরব বর্ধন করেন। এর তিন বছর পরেই রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তারপর গঙ্গাধর রাও ঝাঁসীর গদি লাভ করেন। সেই গঙ্গাধর রাও দত্তক গ্রহণ করে কোম্পানীর দরবারে যখন এই রকম আবেদন করলেন, তখন অনেকেই আশা করেছিল যে সেই আবেদন বৃথা যাবে না। কিন্তু আবেদন-নিবেদন ও যুক্তিতে ডালহৌসি টললেন না। তিনি ঝাঁসী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করবার আদেশ দিলেন।

ঝাঁসীর দরবারে যেদিন কোম্পানীর প্রতিনিধি মেজর ম্যালকম এসে রাণী লক্ষ্মীবাঈকে এই আদেশ জানালেন, তখন সেই বীরজায়া অবিচার ও অপমানে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁর স্বামীর রাজ্য রক্ষা করবার জন্যে তিনি সন্ধির দোহাই দিলেন, কত যুক্তির অবতারণা করলেন, কত বন্ধুত্বের নিদর্শন দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন বীর-রমণী। তাঁর হৃদয়ের ব্যথা চোখের জলে মিলিয়ে

গেল না। পর্দার অন্তরাল থেকে তিনি বীরদর্পে বৃটিশ প্রতিনিধিকে বললেন : "আমার ঝাঁসী দেব না।"

এই কথা শুনে ম্যালকম স্তম্ভিত হলেন।

কিন্তু কোম্পানীর শক্তি বেশী। তাঁরা ঝাঁসী অধিকার করলেন। দত্তককে স্বীকার করলেন না।

লক্ষ্মীবাঈ তবু বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কাছে আবার চিঠি লিখলেন। দত্তক নেবার শাস্ত্রবিধি দেখিয়ে ঝাঁসীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে প্রার্থনা করলেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রার্থনা ও চেষ্টা নিস্ফল হলো। বিঠুরে তাঁর শৈশবের সাথী নানাসাহেবকে লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের এই অবিচারের কথা জানালেন। নানা-সাহেব তার উত্তরে লিখলেন : "একই নিয়তি আমাদের দুজনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। আমি শুধু সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় আছি, বোন! আমারও হৃদয়ে তুষের আগুন জ্বলছে।"

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা গোলমালে ঝাঁসী অধিকার করলো।

কিন্তু তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাঈ-এর হৃদয়ে অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল। ক্ষোভে, রোষে ও অপমানে বীরাঙ্গনা জ্বলে পুড়ে মরতে লাগলেন। কিন্তু নানার কাছ থেকে চিঠি পেয়ে তিনিও সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। তারপর কিভাবে তিনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই অন্যায় ও অবিচারের প্রতিশোধ নিলেন, সে-কাহিনী পরে বলছি।

ইংরেজ তাঁর কাছ থেকে ঝাঁসী কেড়ে নেবার পর লক্ষ্মীবাঈ দরবারের খরচ কমিয়ে দিলেন। অনেক পুরানো কর্মচারিদের বিদায় দিলেন। মোরোপন্ত আর লক্ষ্মণ রাও রাণীর কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। দামোদর রাও যখন সাত বছরের হলেন, লক্ষ্মীবাঈ খুব ধুমধামের সঙ্গে ছেলের পৈতা দিতে

চাইলেন। কিন্তু টাকা কই? রাজকোষ তো শূন্য। দামোদর রাও-এর নামে কিছু টাকা কোম্পানীর সরকারে গচ্ছিত ছিল। সেই টাকা থেকে রাণী এক লাখ টাকা চাইলেন। গভর্ণমেন্ট উত্তরে লিখলেন যে, ঐ টাকা দামোদর রাও-এর। তিনি বড় হয়ে যখন ঐ টাকা দাবী করবেন, রাণী তখন সেই টাকা ফেরৎ দেবেন বলে যদি প্রতিশ্রুতি দেন এবং চারজন সম্ভ্রান্ত লোককে এর জন্যে জামিন দিতে পারেন, তবেই টাকা দেওয়া যেতে পারে। কোম্পানীর কাছ থেকে এই রকম জবাব পেয়ে রাণী খুব দুঃখিত হলেন। অদৃষ্টই মন্দ, সেই জন্য দুঃখ তাঁকে সহ্য করতে হলো। তিনি নিরুপায় হয়ে কোম্পানীর প্রস্তাবে রাজী হলেন। লাখ টাকা খরচ করে তিনি ছেলের পৈতে দিলেন।

সেই থেকে ধর্মকর্ম করে রাণীর দিন কাটতে লাগল।

নানারকম বার-ব্রত করে তিনি শোক, তাপ ও অশান্তি ভুলে থাকতেন।

তিনি রাত চারটের সময়ে ঘুম থেকে উঠে, স্নান শেষ করে শিবপূজো করতে বসতেন। আটটার সময়ে তাঁর শিবপূজা শেষ হতো। তারপর যোদ্ধার মত পরিচ্ছদ পরে প্রাসাদের বিরাট প্রাঙ্গনে চার-পাঁচটা ঘোড়া নিয়ে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে তাদের চালাতেন। এগারটার সময়ে আবার স্নান। তারপর দান-ধ্যান। তারপর খাওয়া। খাওয়া শেষ হলে বেলা তিনটে পর্যন্ত এক হাজার একশো রামনাম আট রকম চন্দন দিয়ে ছোট ছোট কাগজে লিখতেন। তারপর সেই কাগজগুলো ময়দার গুটির মধ্যে পুরে তা মাছদের খাওয়াতেন। সন্ধ্যেবেলা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত পুরাণ শুনতেন। যাঁরা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইত, রাণী তাদের সঙ্গে এই সময়ে সাক্ষাৎ করতেন। তারপর আবার স্নান করে পূজো করতে বসতেন। রাত দুটোর আগে তিনি শুতেন না।

গৃহদেবী মহালক্ষ্মী। প্রত্যেক শুক্রবারে উপোস করে, সন্ধ্যেবেলায় মহালক্ষ্মীর মন্দিরে দেবীদর্শনে যেতেন। স্বামী মারা যাবার পর প্রথম তিন বছর লক্ষ্মীবাঈ এই রকম কঠোর-ভাবে জীবন কাটিয়েছিলেন।

ইংরেজের প্রতি রাণীর বিরাগ-বিদ্বেষ দিন দিন বেড়ে চলে।

ঝাঁসী ইংরেজদের অধিকারে চলে যাবার পর এখানে অবাধে গোহত্যা চলতে থাকে। লক্ষ্মীবাঈ আপত্তি করলেন। বৃটিশ প্রতিনিধির কাছে লিখে পাঠালেন: "ধর্মপ্রাণ হিন্দুর কাছে গোহত্যা অত্যন্ত ধর্মহানিজনক। আমি এর প্রতিকার চাই। আমার রাজ্যে গোহত্যা যেন না হয়।" ঝাঁসীর প্রজারাও গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে জানিয়ে প্রতিকারের প্রার্থনা করল। কিন্তু তাঁরা গরু হত্যা বন্ধ করতে রাজী হলেন না।

তারপর রাণীকে তাঁর স্বামীর ঋণ শোধ করতে বলা হলো।

রাণী এই অসঙ্গত আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি দেখালেন। বৃটিশ প্রতিনিধি সেই যুক্তির কথা লেফটেনেণ্ট-গভর্ণরের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছু হলো না। এই দেনার জন্য রাণীর মাসোহারা থেকে কিছু টাকা কমিয়ে দেওয়া হলো। রাণী বললেন, তাঁর স্বামীর দেনা তাঁর নিজের দেনা নয়, সুতরাং তিনি তার জন্যে দায়ী হতে পারেন না। তিনি ঝাঁসী ছেড়ে কাশীতে গিয়ে বাস করতে চাইলেন। গভর্ণমেণ্ট রাজী হলেন না। এই রকম বার বার অত্যাচার অবিচারের কি কুফল হতে পারে লেফটেনেণ্ট গভর্ণর কলভিন তা একবারও চিন্তা করলেন না। যদি করতেন, তাহলে তিনি চমকে উঠতেন।

দিন যায়।

ইংরেজের প্রতি লক্ষ্মীবাঈ-এর বিরাগ ঘনীভূত হতে লাগল। পুরুষের ক্ষমতা ও নারীর হিংসা দুই-ই তাঁর মধ্যে ছিল। তিনি

শুধু সুযোগের অপেক্ষায় রইলেন। ঝড় একদিন উঠবেই, রাণী ঠিক বুঝেছিলেন এবং তখনই তাঁর প্রতিহিংসা নেবার সময় উপস্থিত হবে।

ঝড় একদিন সত্যিই উঠল।

আট বছর ভারত সাম্রাজ্য শাসন করে, ধীরে ধীরে একটার পর একটা প্রধান প্রধান রাজ্যগুলো কোম্পানীর অধীনে এনে, লর্ড ডালহৌসি বিদায় নিলেন ১৮৫৬ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। নতুন গভর্ণর-জেনারেল এলেন লর্ড ক্যানিং। ভারতের মাটিতে পা দিয়েই লর্ড ক্যানিং দেখতে পেলেন, ভারতবর্ষের আকাশের একপ্রান্তে একখণ্ড কালো মেঘ। এক বছরের মধ্যেই সেই মেঘ ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করে, সারা ভারতবর্ষের আকাশ ছেয়ে ফেললো। তারপর সেই পুঞ্জীভূত গাঢ় মেঘের অন্তরাল থেকে চকিতে ডেকে উঠল বাজ, খেলে গেল বিদ্যুৎ। উঠল তুমুল ঝড়। আলোড়িত হলো সারা ভারতবর্ষ। টলে উঠল ইংরেজ বণিক কোম্পানীর সিংহাসন। তারই ভেতর দিয়ে এল সিপাহী বিদ্রোহ। অগ্নিক্ষরা সেই বিদ্রোহের তরঙ্গ-শীর্ষে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্যে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন নানাসাহেব আর লক্ষ্মীবাঈ।

॥ ছয় ॥

বিঠুর দরবার। ১৮৫৭ অব্দের এপ্রিল মাসের একদিন। সন্ধ্যাবেলা।

দরবার ঘরের মধ্যে তিনজন। ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেব, আজিমউল্লা আর তাঁতিয়া তোপি। তিনজনেই গভীর মনোযোগের সঙ্গে ভারতবর্ষের একখানা মানচিত্র দেখছেন। হাজার বাতির ঝাড়ের আলোয় ঘরের ভেতরটা দেখাচ্ছে একেবারে দিনের মত। নানাসাহেবের আঙুল এসে থামল মানচিত্রের একটি জায়গায়। জায়গাটির নাম মিরাট। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষে কোম্পানীর যে কয়টা ছাউনি (সেনানিবাস) ছিল, তাদের মধ্যে মিরাট হলো প্রধান। নানাসাহেব বললেন—"এইখানেই আমাদের বিপ্লবের ভেরী বেজে উঠবে।"

তাঁতিয়া তোপি জিজ্ঞাসা করলেন, "দেশের অবস্থাটা এখন কি রকম? তুমি তো দিল্লী, লক্ষ্ণৌ ও কানপুর ঘুরে এলে, কোথায় কি দেখে এলে, কি শুনে এলে, বলো?"

—সকলের মুখেই আজ চর্বি-ভর্তি টোটার কথা। কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে এই নিয়ে দেখা দিয়েছে দারুণ অসন্তোষ। নতুন টোটায় আছে গরু আর শূয়োরের চর্বি আর এই টোটা দাঁত দিয়ে কেটে নতুন বন্দুকে ভরতে হবে। এই শুনে কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকল সিপাহীই জাত যাবে ধর্ম যাবে বলে ক্ষেপে উঠেছে। কোম্পানীকে তারা তাদের ঘোর শত্রু বলে মনে করেছে। দূর দেশে কোথাও যুদ্ধে পাঠালে সিপাহীদের বেশী মাইনে দেবার নিয়ম আছে; কিন্তু সে নিয়ম শুধু কাগজে

কলমে। কোথাও তারা বেশী মাইনে পায়নি। এর জন্যেও তাদের মনে দারুণ অসন্তোষ।

—কোম্পানী বলেছিলেন, হিন্দু-সিপাহীদের সমুদ্র পারে যেতে বলা হবে না, কারণ সমুদ্রপারে যাওয়া তাদের চিরদিনের আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে, শাস্ত্রের বিধানের বিরুদ্ধে। অথচ ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সিপাহীদের ওপরে হুকুম এল। তাদের মন চঞ্চল ও উত্তেজিত হয়ে উঠল। চাকরীতে তাদের কোন উন্নতি নেই, নেই ভবিষ্যতের জন্যে কোন ভাল ব্যবস্থা। এইসব কারণে বাংলা থেকে পাঞ্জাব—সকল জায়গায় সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। তাদের মধ্যে এই যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, এই-ই হবে আমাদের হাতে প্রধান হাতিয়ার। আমি এই হাতিয়ারকেই কোম্পানীর বিরুদ্ধে লাগাবার আয়োজন করেছি।

—দেশের জনসাধারণের মনের ভাবটা কি রকম? জিজ্ঞাসা করলেন আজিমউল্লা।

—কানপুর, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী ঘুরে জনসাধারণের মধ্যেও লক্ষ্য করলাম দারুণ অসন্তোষ। কোম্পানীর শাসনে কেউ-ই আজ খুশি নয়। ডালহৌসির এই আট বছরের শাসন—শাসন নয়, শাসনের নামে স্বৈরাচার, এই কথাই তারা বলে। তাঁর রাজ্য-লিপ্সা, কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলকেই আজ শত্রু করে তুলেছে। অযোধ্যার ব্যাপারেই দেশবাসীর মনে বেশী অসন্তোষ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে। নবাব সুজাউদ্দৌলার আমল থেকেই কোম্পানী ছলে বলে ও কৌশলে তাঁর রাজত্ব ধীরে ধীরে গ্রাস করতে আরম্ভ করেন—সে-ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা আছে।

বর্গীর হাঙ্গামা উপলক্ষ করে ইংরেজ প্রথমে নিল নবাবের চুণার দুর্গ ও এলাহাবাদ। তারপর হেস্টিংস-এর টাকার অভাব হলে পরে নবাবের কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকা

নিয়ে হেস্টিংস এলাহাবাদ ও কোরা এই দুটো জেলা আবার নবাবের কাছেই বিক্রী করলেন। তারপর কোম্পানী অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে একটার পর একটা সন্ধি করেন আর কাশী, জৌনপুর, গাজীপুর প্রভৃতি এক একটা বিভাগ কোম্পানীর কবলে চলে যায়। তার ওপর নবাবের রাজ্যে যেসব ইংরেজ সৈন্য থাকত, তাদের জন্যে নবাবের বছরে খরচ হতো ছিয়াত্তর লক্ষ টাকা। তারপর এলেন লর্ড ওয়েলেসলি। তিনি এসে নবাবের সঙ্গে একটা অদ্ভুত সন্ধি করলেন।

—সেই সন্ধিটা কী? জিজ্ঞাসা করলেন তাঁতিয়া তোপি।

—সেই সন্ধিতে বলা হলো, নবাবকে একটা বার্ষিক বৃত্তি দেওয়া হবে, যেমন দেওয়া হয় দিল্লীর বাদশাহকে। নবাব রাজত্ব ছেড়ে দেবেন, কিম্বা বৃটিশ সৈন্যের খরচের জন্যে অর্ধেক রাজ্য কোম্পানীকে দিয়ে দেবেন।

—নবাব কি করলেন? জিজ্ঞাসা করেন আজিমউল্লা।

—নবাব রাজ্যের অর্ধেকটা দিয়েই বন্ধুত্ব বজায় রাখলেন। কিন্তু এখানেই শেষ হলো না। নেপাল যুদ্ধের সময়ে অযোধ্যার নতুন নবাবকে এক কোটি টাকা দিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হলো। তার ওপর কোম্পানী তাঁর কাছ থেকে আরো এক কোটি 'ধার' বলে চেয়ে নিলেন। বন্ধুত্ব পাকা হলো। তারপর একজন করে গভর্ণর জেনারেল আসেন আর অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে একটা করে নতুন সন্ধি হয়। শেষবারের সন্ধিতে বলা হলো, নবাবের রাজ্যে যদি কখনো শৃঙ্খলার অভাব ঘটে, তা'হলে কোম্পানী তাঁর রাজ্য নিয়ে নেবেন এবং শৃঙ্খলাস্থাপন করে রাজ্য আবার নবাবের হাতে ফিরিয়ে দেবেন। বন্ধুত্ব বজায় থাকবে।

—বড় চমৎকার সন্ধি ত! বললেন তাঁতিয়া তোপি।

—হ্যাঁ, চমৎকার ও চাতুর্যপূর্ণ এই সন্ধির ছিদ্রপথ দিয়েই ডালহৌসি এসে অযোধ্যা গ্রাস করলেন। তিনি এসে দেখলেন

নবাবের রাজ্যে কোথাও শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। অতএব সন্ধির দোহাই দিয়ে অধিকার করে নিলেন অযোধ্যা। এইভাবেই কোম্পানী বন্ধুত্বের সম্মান রাখলেন। আর কী বেপরোয়া লুঠই না হয়েছিল সেই সময়ে।

—হ্যাঁ, সে লুঠের কথা আমি শুনেছি। বললেন আজিম-উল্লা। —আমারই এক আত্মীয় ছিলেন নবাব ওয়াজেদ আলির খাস মুন্সী। তাঁরই কাছে শুনেছি, নবাবের ধনসম্পত্তি, প্রাসাদের আসবাব পত্র, কাপড়, গাড়ি লাইব্রেরীর দু'লাখ দামী পুঁথি, হাতী, ঘোড়া—এসবই প্রকাশ্য নীলামে বিক্রী হয়েছিল। আর সেই টাকা দিয়ে ভরিয়ে তুললো কোম্পানীর ধনাগার। তারপর কর্মচারীরা অন্দর মহলে ঢুকে জোর করে নবাবের বেগমদের বাইরে নিয়ে এল, জোর করে তাঁদের জিনিসপত্র রাস্তায় ফেলে দিল। এমনি করেই অযোধ্যায় অসন্তোষ আর বিদ্বেষ জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল।

—তা ছাড়া, নানাসাহেব বললেন, আমি দেখে এলাম উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে জমির বন্দোবস্ত, তালুকদারী স্বত্বের লোপ ও জমি ক্রোক হওয়ায় কী ভীষণ অসন্তোষেরই না সৃষ্টি হয়েছে। কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের খুশিমত জমির বিলি-বন্দোবস্ত করেছে। যার দুশো বিঘে জমি ছিল, তার বেশীর ভাগ জমি কেড়ে নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে টাকা নিয়েছে। এমনি করে অযোধ্যার সমস্ত তালুকদার গরীব হয়ে পড়েছে। অনেকেরই সম্পত্তি নিলামে বিক্রী হয়েছে। এমনি করেই তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ-করা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। মোগলদের সময় থেকে যারা লাখেরাজ জমি (যে জমির জন্যে কোনো কর দিতে হয় না) ভোগ করে আসছিল, তাদেরও আজ ভীষণ অবস্থা। দলিলের অভাবে তাদের এই নিষ্করজমি ভোগ করা ঘুচে গেছে। কোম্পানীর বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ও উত্তেজনার এও একটা কারণ।

—আচ্ছা মোগল-রাজধানীর খবর কি? জিজ্ঞাসা করলেন তাঁতিয়া তোপি।

—দিল্লীর প্রাসাদের লোকেরা বলাবলি করছে, শীগ্‌গির একটা কিছু কাণ্ড হবে। বাহাদুর শাহকে কোম্পানী এখনো উপাধিচ্যুত করেনি, তবে রাজ ক্ষমতা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনেকখানি হস্তগত হয়েছে। বাদশাহের নামাঙ্কিত মুদ্রাও নেই। আগে কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহদের যে নজর সেলামী দিত, তাও বন্ধ হয়ে গেছে। বাহাদুর শাহ পারস্যের শাহের সঙ্গে এখন মন্ত্রণা করছেন। মোগল প্রাসাদে, সম্রাটের খাসকামরায় দিনরাত ইংরেজের বিরুদ্ধে আলোচনা চলছে। প্রাসাদের হাকিম আসানউল্লার কাছ থেকে আমি এসব কথা শুনেছি। দিল্লীর সাধারণ লোকের মধ্যেও উত্তেজনা খুব। জুম্মা মসজিদের গায়ে ইস্তাহার টাঙিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে শীগ্‌গির ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হবে। মোট কথা, দিল্লীও বারুদখানা হয়ে আছে। কোম্পানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিরাগ ও বিদ্বেষ কেবল হিন্দুর নয়, মুসলমানদেরও। আমি এই বিরাগ ও বিদ্বেষকেই কাজে লাগাতে চাই।

—বিহারের খবর কী? জিজ্ঞাসা করলেন আজিমউল্লা।

—বিহারের জনসাধারণও দলবদ্ধ হয়ে বিপ্লব ঘটাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে খবর পেলাম। দানাপুরে সিপাহীদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনার ভাব দেখে পাটনার ইংরেজরা খুব ভয় পেয়েছে। কাশীতে ও ব্যারাকপুরে সিপাহীদের কাছ থেকে যে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এ খবর দানাপুরের সিপাহীরা পেয়েছে। পাটনার তিনজন মৌলবী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। তাঁরা মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন যে, কোম্পানীর মুল্লুক ধ্বংস হবার সময় এসেছে।

এ ছাড়া, কুমার সিংহ আছেন সিপাহীদের পক্ষে। এই বৃদ্ধ রাজপুত যেমন প্রতাপশালী তেমনি তেজস্বী। একসময়ে

ইনি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরক্ত ছিলেন। এখন সেই অনুরাগ বিরাগে পরিণত হয়েছে। ভক্তির বদলে তাঁর মনের মধ্যে দেখা দিয়েছে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ, আর ঘৃণা। কোম্পানী অন্যায়ভাবে কুমারসিংহের জমিদারী কেড়ে নিয়েছে, অথচ তিনিই এক সময়ে ইংরেজদের সাহায্য করেছিলেন টাকা দিয়ে। কুমারসিংহের বিশ্বস্ত বন্ধু সৈয়দ আজিমউদ্দিন হুশেনের কাছ থেকে আমি খবর পেয়েছি যে দানাপুরের সিপাহীদের সঙ্গে তিনি গোপনে পত্রালাপ চালাচ্ছেন। তিনি তাঁর রাজধানী জগদীশপুরে বসে আসন্ন বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন।

—বাংলার খবর কী? জিজ্ঞাসা করলেন তাঁতিয়া তোপি।

—এইখানেই ত বিপ্লবের প্রথম তূর্যধ্বনি হয়েছে বারাকপুরের ও বহরমপুরে, এই দু'জায়গাতেই সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। বাংলাদেশে গোরা সৈন্য নেই বললেই হয়, সেইজন্যে রেঙ্গুন থেকে একদল ইংরেজ সৈন্য আনা হয়েছে। বহরমপুরের একদল সিপাহীকে প্রথমে নিরস্ত্র করা হয়। চর্বি-ভর্তি টোটা থেকেই সেখানে এই গোলমালের শুরু। বারাকপুরের সিপাহীদের মনের মধ্যে ভীষণ সন্দেহ দেখা দেয়। তাদের বিশ্বাস নতুন রাইফেল-বন্দুকে গরু-শূয়োরের চর্বি মেশানো টোটা ব্যবহারের ব্যবস্থা করে, ইংরেজ তাদের জাত ও ধর্ম নষ্ট করবার মতলব করেছে।

রাজধানী কলকাতায় ইংরেজদের মনেও খুব ভয়—এই বুঝি সিপাহীরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ আক্রমণ করল। এই অবস্থার মধ্যে বারাকপুরের চৌত্রিশ নম্বর পল্টনের এক সিপাহী মঙ্গল পাঁড়ে—২৯শে মার্চ, রবিবার, একজন ইংরেজ সার্জেণ্ট-মেজরকে গুলি করল। তারপর সে ছাউনির আর সব সিপাহীকে ডেকে বলল—'এসো, আমাকে অনুসরণ কর আমি যা করছি, তাই করো। ধর্মরক্ষার জন্যে যদি মরতে হয়, তাও মরব;

এসো, আমরা একসঙ্গে মরব।' কিন্তু কেউ-ই বিদ্রোহী হতে এগিয়ে এলো না।

—তারপর কি হলো? জিজ্ঞাসা করলেন তাঁতিয়া তোপি।

—তারপর ইংরেজ সেনাপতি যখন সসৈন্যে বিদ্রোহী মঙ্গল পাঁড়েকে ধরতে এলেন, তখন সে নিজের বুকের দিকেই বন্দুকের মুখ ফেরাল। বন্দুকের গোড়াটা মাটিতে রেখে নলটা নিজের বুকে রাখল। পা-টিপে আওয়াজ করল। আহত হয়ে মঙ্গল পাঁড়ে মাটিতে পড়ে গেল। বাংলার মাটি শহীদের রক্তে লাল হলো। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। হাসপাতালের চিকিৎসায় সেরে উঠলে পরে তাকে সামরিক আদালতে বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বিচারে মঙ্গল পাঁড়ের ফাঁসির হুকুম হয়। ৮ই এপ্রিল বারাকপুরে সকলের সামনে তার ফাঁসি হয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহের এই প্রথম শহীদকে আমি নমস্কার জানাই।

—পাঞ্জাবের খবর কী? জিজ্ঞাসা করলেন আজিমউল্লা।

—আম্বালার সেনানিবাসেও সিপাহীদের মধ্যে চর্বি-টোটা নিয়ে অসন্তোষ ও আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছে, এ খবর আমি পেয়েছি। লাহোর, ফিরোজপুর, অমৃতসর, লুধিয়ানা, এমন কি সীমান্তে পেশোয়ার পর্যন্ত এই অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতের আকাশে মেঘ গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়ে উঠেছে। আমি যেন বিদ্রোহের পদক্ষেপ শুনতে পাচ্ছি। ফকির পির আলি বলেছেন, এক শ বছর পূর্ণ হলে কোম্পানীর মুল্লুক আর থাকবে না।

—একশ বছর ত পূর্ণ হতে চললো, বললেন তাঁতিয়া তোপি। —যা শুনলাম তাতে এই বুঝলাম যে গোখাদক ও শূকরখাদক ফিরিঙ্গীরা আমাদের দেশবাসিদের জাতিচ্যুত ও ধর্মচ্যুত করতে সংকল্প করেছে। মঙ্গল পাঁড়ের আত্মদান

বিদ্রোহের সূচনামাত্র। কিন্তু এই অসন্তুষ্ট সিপাহীদের সংঘবদ্ধ করে ঠিকভাবে চালাবে কে?

—বিদ্রোহ যখন আসে, তখন হিসেব করে আসে না। তবে যতদূর সম্ভব আমি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বিদ্রোহ পরিচালনা করবার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু আমার ভূমিকা পৃথক। আমি এখন কিছুদিন বাইরে ইংরেজের বন্ধু সেজেই থাকব, যাতে কোম্পানী আমাকে এতটুকু অবিশ্বাস বা সন্দেহ করতে না পারে। তারপর কানপুরকে কেন্দ্র করে আমি আঘাত হানব ইংরেজকে—এমন প্রচণ্ড আঘাত হানব যে ইংরেজ তা যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে। ডালহৌসির অবিচার আমি ভুলিনি।

—আমরা আর কোন রাজা মহারাজার সাহায্য পাব কিনা? জিজ্ঞাসা করলেন আজিমউল্লা।

—সে-ব্যবস্থাও করেছি। তোমার বোধ হয় মনে আছে আজিম, অযোধ্যা পতনের দু'তিন মাস আগে থেকেই আমি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার অনুরোধ জানিয়ে ভারতের অনেক রাজা ও নবাবের দরবারে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। অনেকের কাছ থেকেই যা উত্তর পেয়েছি তাতে আমার মনে খুবই আশা হয়, আমরা কোম্পানীর মুল্লুক ধ্বংস করতে পারব। জম্মু থেকে কাশ্মীরের মহারাজ গোলাব সিংহ ত এরই মধ্যে অযোধ্যার এক তালুকদারের মারফৎ কিছু টাকাও আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে গেলেন—নানাসাহেব এরই মধ্যে কতদূর অগ্রসর হয়েছেন। সে-রাত্রের মতো আলোচনা এই পর্যন্ত হলো।

বিঠুর দরবারে এমন গভীর আলোচনা এর আগে আর কোনো দিন হয়নি।

॥ সাত ॥

নানাসাহেবের কথাই সত্যি হলো।

মিরাটেই বিপ্লবের ভেরী বেজে উঠল।

সেদিন ছিল রবিবার, ১০ই মে। সকালবেলা।

তার আগের দিন মিরাট ছাউনির পঁচাশীজন বিদ্রোহী সিপাহীর সাজা হয়ে গেছে। সকলের সামনে দণ্ডিত সিপাহীদের পোষাক খুলে নিয়ে, তাদের হাতে পায়ে লোহার বেড়ি দিয়ে জেলে পাঠান হয়েছে। কারো সাজা পাঁচ বছর, কারো দশ বছর। তাদের অপরাধ ৮ই মে-র প্যারেডে এরা সেনাপতির আদেশ অমান্য করে, চর্বি-টোটা দাঁত দিয়ে কাটতে চায়নি। এই কঠোর কারাদণ্ডে ছাউনির অন্যান্য সিপাহীরা চঞ্চল হলো। ইংরেজের এই নির্মম ব্যবহারে অন্য সিপাহীরা প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে উঠল।

মিরাট ক্যান্টনমেণ্ট ভারতবর্ষের মধ্যে তখন খুব বড় সৈনিক-নিবাস। এর পরিধি প্রায় পাঁচ মাইল। মাঝখানে ময়দান। ময়দানের মাঝখান দিয়ে একটা নালা গিয়েছে। একদিকে থাকে গোরা সৈন্য, অন্যদিকে সিপাহীরা। ক্যাণ্টনমেণ্টের মধ্যেই গির্জা। উত্তরদিকে প্যারেডের বিস্তৃত মাঠ। চারদিকে নানা গাছপালা-ঘেরা বাগান। ক্যান্টনমেণ্টের দক্ষিণদিকে মিরাট শহর। সব রকম সৈন্যই এখানে থাকে—গোলন্দাজ, ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক। আর প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র।

রবিবারের সকালবেলা। মে মাসের প্রখর সূর্য উঠেছে। সকাল থেকে ইংরেজ অফিসারদের বাংলোয় কোন চাকর কাজে আসেনি। এমন ত কখন হয় না। একটু সন্দেহ দেখা দিল ইংরেজদের মনে। দিন কেটে গেল। সন্ধ্যাবেলায় গির্জায়

উপাসনা করতে যাবার জন্যে ইংরেজ নর-নারী তৈরী হয়। পাদরী নর্টন তাঁর মেমসাহেবকে নিয়ে গির্জায় যাবেন বলে বেরুলেন। হিন্দুস্থানী আয়া বললে, "আজ যাবেন না, খুব বিপদ হবে। বাজারে খুব গণ্ডগোল শুনে এলাম।"

—কিসের গণ্ডগোল? জিজ্ঞাসা করেন পাদরী নর্টন।

—কি জানি কিসের গণ্ডগোল। সবাই বলাবলি করছে, আজ কি একটা ভয়ানক কাণ্ড হবে।

—কি ভয়ানক কাণ্ড?

—সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে।

পাদরী হাসলেন। আয়ার কথায় বিশ্বাস করলেন না। স্ত্রীপুত্রকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন, গাড়ি হাঁকিয়ে গির্জায় চললেন। গির্জায় ঢুকে তিনি দেখলেন, আর একজন পাদরী ও অনেকগুলো ইংরেজ বসে আছেন। সকলেরই মুখ শুক্‌নো। সকলেই উদ্বিগ্ন।

সন্ধ্যা হলো। হঠাৎ ভেরী আর বন্দুকের শব্দ আর উত্তেজিত জনতার ভৈরব কোলাহল মিরাটের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুললো। ইংরেজরা বুঝলো মিরাটের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। উন্মত্ত সিপাহীর দল প্রথমেই জেলখানা ভেঙে সেই পাঁচাশীজন দণ্ডিত সিপাহীকে উদ্ধার করল। ইংরেজদের ছাউনি সিপাহীদের ছাউনি থেকে অনেক দূরে ছিল বলে সিপাহীদের এই উত্তেজনার বিষয় তারা প্রথমে কিছুই জানতে পারেনি।

মিরাটে বিপ্লব আরম্ভ হলো।

হিন্দু ও মুসলমান একমন একপ্রাণ হয়েই কোম্পানীর বিরুদ্ধে দাঁড়াল।

প্রায় সব সিপাহীই এই বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। ইংরেজরা ভয় পেল। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। উন্মত্ত সিপাহীদের গুলিতে অনেক ইংরেজ মরল,

অনেকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে লুকোবার চেষ্টা করল। এদিকে ইংরেজদের বাংলোগুলোয় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। রাস্তায়, মাঠে, ঘাটে, মানুষের রক্ত বয়ে গেল। প্রায় সারা রাত ধরে ইংরেজ হত্যা, ইংরেজদের বাড়ী পোড়ান আর লুঠ চলতে লাগল। এগার নম্বর পলটনের কর্ণেল ফিনিস সেই রাত্রে ঘোড়ায় চড়ে সিপাহীদের ছাউনিতে গেলেন। মাঝপথেই একজন বিদ্রোহীর গুলিতে তাঁর ঘোড়াটা আহত হলো। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা আওয়াজ। বন্দুকের গুলি এইবার কর্ণেলের পিঠ ভেদ করে চলে গেল। তিনি আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন তাঁর ওপর গুলির ওপর গুলি এসে পড়তে লাগল। সারাদেহে গুলিবিদ্ধ হয়ে কর্ণেল তখুনি মারা গেলেন।

দেখতে দেখতে সমস্ত পলটনের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। পদাতিকদলের সিপাহীরা আশ্বারোহীদলের সওয়ারেরা এক যোগ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল। হিন্দু-মুসলমানেও একজোট একসঙ্গে ফিরিঙ্গী নরনারী ও বালকবালিকাদের নিধন করতে কৃতসংকল্প। গির্জা থেকে সাহেবরা ফিরছিল ; কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ ঘোড়ায় চড়ে, কেউ বা গাড়ি চড়ে। উন্মত্ত সিপাহীরা হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের ওপর এসে পড়ল, ছোট-বড় বিচার না করে সবাইকে হত্যা করতে আরম্ভ করল। কাউকে গুলি করে মারল, কাউকে কাটল তলোয়ার দিয়ে। শিকারের গন্ধ পেয়ে হিংস্র বাঘেরা যেমন গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ে, শহরের প্রত্যেক রাস্তা থেকে, শহরতলী থেকে বিদ্রোহীরা তেমনি দলে দলে বেরুতে লাগল। ক্যাণ্টনমেণ্টের ধনাগার লুঠ করাও বিদ্রোহীদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু রাত শেষ হয়ে এল দেখে উন্মত্ত সিপাহীরা 'দীন্ দীন্' রবে ছুটল দিল্লীর দিকে।

রাতে যারা পালিয়েছিল, দিনের আলোয় সেইসব ইংরেজ আস্তে আস্তে মাথা তুলে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে দেখল,

তাদের অনেক বন্ধু-বান্ধবের মৃতদেহ, আর বাড়িঘরের ভস্মস্তূপ। ইংরেজরা প্রতিহিংসা নেবার জন্যে তৈরি হয়। দোকানদার ও পল্লীবাসীদের বিদ্রোহী সন্দেহ করে ফাঁসি দিতে আরম্ভ করল আর গুলি করে মারতে লাগল। রাতে যারা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, তারাই সিপাহীরা নেই দেখে, সকালবেলায় বীর সেজে, শুধু সন্দেহের বশে হত্যাকাণ্ড চালাতে লাগল। আগের দিন রাতে বিদ্রোহীরা সারারাত ধরে চালিয়েছে হত্যা, বাড়ি পোড়ান আর লুঠ। পরের দিন সকালে সাহেবলোকেরা ঠিক করল, এইবার আমাদের পালা। চারদিকের হত্যাকাণ্ড দেখে ইংরেজদের মনে ধাঁধা লেগেছিল, তারা হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল।

মিরাটের পর দিল্লীতে বিদ্রোহের ভেরী বেজে উঠল।

মোগল বাদশাহদের দিল্লীর সে মহিমা তখন আর নেই। অনেক অধঃপতন হয়েছে।

বাদশাহ শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে বছরে দশ লক্ষ টাকা বৃত্তি নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলেন। এই শাহ আলমই ইংরেজ বণিক কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়েছিলেন। তিনি মারা গেলে পরে তাঁর ছেলে আকবর শাহের সময়েও বাদশাহী ফরমান ছাড়া কোম্পানী কোন নতুন প্রদেশ অধিকার করতে পারতেন না। তখনো ইংরেজ প্রতিনিধিকে খালি পায়ে দূর থেকে সেলাম করতে করতে তাঁর দরবারে আসতে হতো, তখনো টাকার ওপর তাঁরই নামের ছাপ থাকত। কোম্পানী সময় ও সুযোগ বুঝে একে একে দিল্লীর বাদশাহের সমস্ত সম্মান ও ক্ষমতা লোপ করল। তারপর যাট বছরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ যখন সিংহাসনে বসলেন, তখন তিনি নামে মাত্র সম্রাট, না আছে সম্রাটের কোনো চিহ্ন, না আছে কোন ক্ষমতা। সামান্য বন্দীর মত তিনি মোগল প্রাসাদে বাস করতেন।

বাহাদুর শাহের পিতা আকবর শাহ মনে করতেন যে, কোম্পানী তাঁকে যে মাসোহারা দেন, সেটা দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে খুবই সামান্য! কাজেই তাঁকে অনেক কষ্টে বাদশাহী ঠাট বজায় রাখতে হতো। বৃত্তি বাড়াবার জন্যে তিনি কত আবেদন-নিবেদন করলেন, কোম্পানী তাঁর কথায় কান দিলেন না। আর কোনো উপায় না দেখে, বিলাতে দরবার করবার জন্যে বাদশাহ একজন দূত পাঠালেন। এই বিখ্যাত দূত রামমোহন রায়। বাদশাহ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে তাঁর দূত করে লণ্ডনে পাঠিয়েছিলেন।

ইংলণ্ডে দিল্লীর সম্রাটের আবেদন ব্যর্থ হলো। কোম্পানীর ডিরেক্টররা কোন কথাই শুনলেন না। তারপর আকবর শাহের ছেলে বাহাদুর শাহ বেঁচে থাকতেই কোম্পানী ঠিক করলেন যে, তাঁর পর যিনি দিল্লীর সিংহাসনে বসবেন, তাঁকে আর 'রাজা' বলে স্বীকার করা হবে না। এমন কি, তার সব স্বত্ব লোপ পাবে। এই ভাবে সেদিন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগলের মহিমাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে চেয়েছিল। কোম্পানীকে আশ্রয় দিয়ে, তার বাণিজ্যের সুবিধে করে দিয়ে, তাকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দিয়ে, দিল্লীর রাজবংশ শেষে এই পুরস্কার লাভ করলেন। মোগল বাদশাহের এই শেষ পরিণতিতে দিল্লীর জনসাধারণ খুব চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

তাই মিরাটের বিদ্রোহীরা দিল্লীতে এসে পৌঁছতেই সেখানকার জনসাধারণ তাদের জানাল অভ্যর্থনা। মিরাট থেকে ১০ই মে রাত্রিতে চাঁদের আলোয় পথ করে নিয়ে অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীরা দিল্লীতে ছুটল। ১১ই মে, সকাল বেলা তারা যমুনার তীরে এসে পৌঁছল। সকালবেলার আলোয় যমুনার জল সোনার মত চিক্ চিক্ করছিল। তখনো

পুরবাসীরা ঘুমিয়ে। সামনে শোভাময়ী দিল্লী শহর। বড় বড় বাড়ীর চূড়োয় এসে পড়েছে সকালবেলার আলো।

মোগল রাজধানীতে পৌঁছে সিপাহীরা নিশ্চিন্ত হলো। নৌসেতু পার হয়ে তারা রাজধানীতে প্রবেশ করল। টেলিগ্রাফের তার কেটে দেওয়া হয়েছিল বলে দিল্লীর ইংরেজেরা মিরাটের কোনো খবরই জানতে পারেনি। বিদ্রোহীরা বাদশাহী প্রাসাদের কাছে এসে চীৎকার করে বললো—"বাদশা খোদাবন্দ! আমাদের আশ্রয় দিন। মিরারেট ইংরেজদের আমরা কেটে ফেলেছি। নিজেদের জাতি ও ধর্ম রক্ষা করবার জন্য আমরা এখানে যুদ্ধ করতে এসেছি।"

দিল্লীর অনেক মুসলমান বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। দিল্লীর সিপাহীরাও যোগ দিল। দেখতে দেখতে একটা তুমুল উত্তেজনার তরঙ্গে মোগলের রাজধানী টলমল করে উঠল। বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেল। দিল্লীর চারদিকেই উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের পাশে চওড়া ও গভীর খাদ। নগরে প্রবেশ করবার আটটা তোরণ বা দরজা আছে। উত্তেজিত সিপাহীরা পথে যে সব ইংরেজদের দেখতে পেল, তাদের সবাইকে মেরে ফেললো এবং তাদের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। ঝড়ের বেগে ছুটল তারা কলকাতা দরজার দিকে। 'ইংরেজদের মারো'—এ ছাড়া বিদ্রোহীদের মুখে আর কোন কথা নেই। সে কী ভীষণ ভৈরব হুঙ্কার। যে শোনে সেই-ই মেতে ওঠে।

সিপাহীরা দিল্লীর রাজপ্রাসাদে ঢুকল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে তারা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষণা করল এবং তাঁর সাহায্য চাইল। প্রাসাদে যত সিপাহী পাহাড়া দিচ্ছিল তারা সবাই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। যে ইংরেজ কাপ্তেনের ওপর প্রাসাদ রক্ষার ভার ছিল, তিনি অবস্থা বেগতিক দেখে খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন। পরে বিদ্রোহীরা তাঁকে তাঁর

বাড়িতে গিয়ে মেরে ফেলে। সেখানে আর যত ইংরেজ নর-নারী ছিল তাদের কেউই পরিত্রাণ পেল না। দরিয়াগঞ্জ বলে একটা জায়গা ছিল। অনেক ব্যবসায়ী ইংরেজ এখানে বাস করত। বেলা দুটোর মধ্যেই এখানকার প্রায় সব ইংরেজকে বিদ্রোহীরা মেরে ফেললো। তারপর তারা ব্যাঙ্ক লুঠ করল, গির্জা পুড়িয়ে দিল।

দিল্লীর সেনানিবাসটা ছিল খানিকটা দূরে। শহরে যে এতসব কাণ্ড হচ্ছে, সে খবর একটু দেরীতেই এল সেখানে। কামান, বন্দুক আর সৈন্য নিয়ে সেনাপতি ছুটলেন কাশ্মীর তোরণের দিকে। পথেই দিল্লীর সিপাহীদলের সঙ্গে মিরাটের বিদ্রোহী সিপাহীদের দেখা। সেনাপতি গুলি ছুঁড়বার হুকুম দিলেন। দিল্লীর সিপাহীরা বন্দুকের মুখ উল্টো করে দাঁড়াল। মিরাটের সিপাহীদের গুলিতে ইংরেজ সেনাপতি মারা গেলেন।

অবস্থা বেগতিক দেখে কামান-বন্দুক ফেলে বাকী ইংরেজ সৈন্যরা পালিয়ে গেল। দিল্লীর সিপাহীরা যোগ দেওয়াতে বিদ্রোহীদের দলবৃদ্ধি হলো। তারা ছুটল অস্ত্রাগার আক্রমণ করতে। দিন গেল, সন্ধ্যা হয়ে এল। এমন সময়ে সমস্ত নগর কাঁপিয়ে একটা ভীষণ শব্দ হলো। ধোঁয়া আর আগুনের শিখা আকাশ ছুঁলো। ব্যাপারটা হয়েছিল কি, সিপাহীরা যখন অস্ত্রাগার আক্রমণ করে, তখন সেখানে যেসব ইংরেজ ছিল, তারা উপায় নেই দেখে বারুদে আগুন লাগিয়ে দিয়ে অস্ত্রাগারটা উড়িয়ে দেয়। সেখানে মরল জনকতক ইংরেজ, কিন্তু শহরের ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় মরল চার-পাঁচশো লোক।

সন্ধ্যের পর বিদ্রোহীরা দিল্লী অধিকার করল। ইংরেজরা যে যেভাবে পারল—গাড়িতে, ঘোড়ায় কিম্বা পায়ে হেঁটে শহর ছেড়ে চলে গেল। কেউ গেল মিরাটের দিকে, কেউ অন্য দিকে। কেউ আশ্রয় নিল ভাঙা বাড়িতে বা জঙ্গলের মধ্যে। কেবল পঞ্চাশ জন ইংরেজকে বাদশাহ ও তাঁর বেগম

অন্দরমহলে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিদ্রোহীরা তাদেরও পরে সারবন্দী করে মেরে ফেলেছিল। সারাদিন ধরে দিল্লীতে যেন ইংরেজের মৃত্যু ঘণ্টা বাজল। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যে—বিদ্রোহীরা ইংরেজদের নানাভাবে হত্যা করেছিল।

ইংরেজরা কেবলই আশা করছিল, মিরাট থেকে বুঝি তাদের সাহায্য করতে ইংরেজ সৈন্যরা আসবে। কিন্তু সূর্য ডুবে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর ইংরেজদের সমস্ত আশা ভরসা ফুরল। তখন পালান ছাড়া উপায় ছিল না। পাঁচ দিনের মধ্যে দিল্লী ইংরেজশূন্য হয়ে গেল।

১৬ই মে-র পর দিল্লী শহরে অথবা দিল্লীর সেনানিবাসে আর একটিও ইংরেজ রইল না।

মোগল রাজধানী-বিদ্রোহীদের অধিকারে এল।

কানপুরে বসে নানাসাহেবও মিরাট ও দিল্লীর বিদ্রোহের খবর পেলেন।

॥ আট ॥

কানপুর।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত অনেক বছর ধরে কানপুরের সেনানিবাস ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান সেনানিবাস। আমরা যে সময়ের কথা বলছি, তখন এখানকার প্রাধান্য অনেকটা কমে গেছে। গঙ্গার তীরে অতি বিরাট এই ক্যান্টনমেন্ট। আয়তনে ছ'সাত মাইল। গঙ্গার দক্ষিণ দিকে ইংরেজদের সেনানিবাস। কাছেই লক্ষ্নৌ যাবার নৌসেতু। এখানে গঙ্গার শোভা খুব সুন্দর। গঙ্গার বুকে সব সময়েই নানা ধরণের নৌকো ভাসছে। নানারকম জিনিসপত্রের আমদানী-রপ্তানী আর নানাদেশের নানা জাতের লোকের জনতা। শহরে সব সময়ই বহুলোকের কোলাহল। গঙ্গার তীরে নানা রকম পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা। পথঘাট খুব ভাল নয়; অধিবাসীদের বাসগৃহের শৃঙ্খলা নেই; দূরে দূরে এক-এক জায়গায় লোকের বসতি।

ক্যান্টনমেন্টের উত্তর-পশ্চিম দিকে দিল্লী ও বিঠুরে যাবার রাস্তা। সেই রাস্তার মাঝখানে ইংরেজ-রাজপুরুষদের বাংলো; সরকারী ধনাগার, জেলখানা আর পাদরীদের নিবাস। এসব বাড়ি ক্যান্টনমেন্টের বাইরে। এরই উত্তর-পশ্চিম দিকে অস্ত্রাগার ও বারুদখানা। শহর ও গঙ্গাতীরের মাঝখানে সাহেবদের গির্জা, টেলিগ্রাফ অফিস এবং অন্যান্য সরকারী বাড়ি।

কানপুরের এক অঞ্চলের নাম নবাবগঞ্জ। এইখানে নানাসাহেবের নিজের একখানা প্রাসাদ ছিল। বিঠুর থেকে তিনি যখন কানপুরে আসতেন, তখন তিনি নবাবগঞ্জের এই প্রাসাদে বাস করতেন। অতি সুসজ্জিত

সেই প্রাসাদে তিনি মাঝে মাঝে কানপুরের ইংরেজ রাজপুরুষদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করতেন, যেমন তিনি মাঝে মাঝে করতেন তাঁর বিঠুরের প্রাসাদে। শুধু উৎকৃষ্ট খাবার জিনিস দিয়ে তিনি যে তাদের পরিতুষ্ট করতেন তা নয়, প্রত্যেককেই বহুমূল্য জিনিসও উপহার দিতেন—কাশ্মীরের কিংখাব থেকে শুরু করে কাশীর সিল্কের কাপড় পর্যন্ত দিতেন। কানপুরের ইংরেজরা নানাসাহেবের এই উদার আতিথ্যে এমনই মুগ্ধ হয়েছিল যে, তাঁকে তারা তাদের একজন পরম বন্ধু বলেই মনে করতো।

এই কানপুর সেনানিবাসের সেনাপতি ছিলেন স্যার হিউ হুইলার।

কোম্পানীর সেনাদলের সবচেয়ে পুরোনো কর্মচারী তিনি। আফগান ও পাঞ্জাবের যুদ্ধে জেনারেল হুইলার খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর অধীনের সিপাহীরা তাঁকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। তার কারণ, হুইলার সাহেব তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কথা বলতেন এবং তাদের স্বভাব ও চালচলন তিনি যেমন জানতেন, আর কোন ইংরেজ অফিসার তেমন জানত না। সত্তর বছর বয়সের এই বৃদ্ধ সেনাপতি ঘোড়ায় চড়তে খুব পটু ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি নিজের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে যেতেন। কানপুরে তখন ইংরেজ সৈন্য খুব কম ছিল। দেশীয় সৈন্য ছিল তিন হাজার। এই দেশীয় সৈন্যদেরই সিপাহী বলা হতো। তখন কোম্পানী সবে অযোধ্যা অধিকার করেছে। সেইজন্যে সেখানকার শান্তি রক্ষার জন্য বেশী সৈন্যের দরকার হওয়াতে কানপুরের ইংরেজ সৈন্যদের সেখানে পাঠান হয়েছিল।

বারাকপুর ও বহরমপুরের খবর যখন কানপুরে আসে, তখন জেনারেল হুইলারের খুব বেশী ভাবনা হয়নি; কিন্তু মিরাট ও দিল্লীর খবর শুনে তাঁর খুব ভয় হলো। তারপর কানপুরের

সিপাহীদের মধ্যে যখন চাঞ্চল্য দেখা দিল, তখন ইংরেজরা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মিরাট ও দিল্লীর খবরেই তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। তারা চারদিকে শুধু বিভীষিকা দেখতে লাগল। তবে সেনাপতির বিশ্বাস ছিল যে কানপুরে কোন গোলমাল হবে না। তবু ইংরেজরা আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হয়।

ক্যান্টনমেন্টের কাছাকাছি একটা সমান জায়গা। সেখানে শুধু ইংরেজ সৈন্যদের জন্যে দুটো হাসপাতাল ছিল। এই হাসপাতালটাকেই তারা তাদের আত্মরক্ষার জায়গা হিসেবে ঠিক করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে চারদিকে চার ফুটের কিছু বেশী উঁচু একটা বিরাট মাটির পাঁচিল তৈরি করে ফেলা হলো। তারপরেই সেনাপতি হুইলার সৈন্য পাঠাবার জন্যে লক্ষ্ণৌতে স্যার হেনরী লরেন্সকে অনুরোধ করলেন। লরেন্স ছিলেন অযোধ্যার কমিশনার।

কানপুরের কথা বলবার আগে বিদ্রোহ কোথায় কি ভাবে বিস্তার লাভ করল, তা একটু জানা দরকার। মিরাট ও দিল্লীর খবর যখন রাজধানী কলকাতায় পৌঁছল, তখন ইংরেজ মহলে একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। বড়লাট লর্ড ক্যানিং সঙ্গে সঙ্গে একটা নতুন আইন প্রচার করলেন। সেই আইনে বলা হলো, যে-কেউ সরকারের বিপক্ষতা করবে, বিনা উকিলেই তার অপরাধের বিচার হবে। ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশন বা কমিশনার এই বিচার করবেন। তাঁরাই অপরাধীকে প্রাণদণ্ড, নির্বাসন বা কারাদণ্ড দিতে পারবেন। তাঁদের আদেশই চরম আদেশ বলে গণ্য হবে।

পাঞ্জাবে আম্বালায় ইংরেজদের মধ্যে ভয় দেখা দিল। সিমলার ইংরেজরা ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ল। তারা চারদিকে শুধু বিপ্লবের করালমূর্তি দেখতে লাগল। বিদ্রোহীরা মোগলের রাজধানী অধিকার করেছে শুনে কলকাতায় লর্ড ক্যানিং খুব বিচলিত হলেন। তিনি তখনি ভারতের প্রধান সেনাপতি-

জেনারেল আনসন্‌কে দিল্লী উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করলেন। প্রধান সেনাপতি থাকতেন আম্বালায়।

এটাও খুব বড় সেনানিবাস ছিল। বড়লাটের অনুরোধে প্রধান সেনাপতি পাঞ্জাবের নানা জায়গা থেকে সৈন্য জোগাড় করে দিল্লী উদ্ধারের জন্যে তৈরি হলেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভার রাজারা ও কর্ণালের নবাব তাঁদের সৈন্য, অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে লাগলেন। সসৈন্যে দিল্লী যাবার সময়ে পথেই প্রধান সেনাপতি কলেরায় মারা গেলেন। তখন নতুন প্রধান সেনাপতি হলেন জেনারেল বার্ণার্ড।

দেখতে দেখতে পশ্চিমে বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করল। মিরাটে বিদ্রোহীরা অনেক ইংরেজকে মেরে ফেলেছে। দিল্লী বিদ্রোহীদের হাতে চলে গিয়েছে—সেখানে একটা ইংরেজও আর নেই।

এই সব খবর শুনে, গঙ্গা ও যমুনার তীরের সমস্ত বড় বড় শহরের জনসাধারণ খুব চঞ্চল হয়ে উঠল। এই সময়ে কাশীতে খাবার জিনিসপত্রের দাম খুব বেড়ে যায়। সকলেরই ধারণা, কোম্পানীর শাসনের দোষেই এমনটা হয়েছে। দিল্লীর মোগল বংশের যাঁরা এই সময়ে কাশীতে বাস করছিলেন, তাঁরাও জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ প্রচার করেন। তার ওপর নতুন বন্দুক ও টোটার ব্যাপারে ধর্ম নষ্ট হবার ভয়ে হিন্দু ও মুসলমান সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। জুন মাসের প্রথমেই এখানে সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়। তারপর আজমগড়, গাজিপুর, জৌনপুর, বেরিলি, এলাহাবাদ—সর্বত্র বিদ্রোহ প্রচণ্ড আকারে দেখা দিল। সর্বত্রই কলকাতা থেকে প্রচুর ইংরেজ সৈন্য, কামান আর নতুন সেনাপতি পাঠান হলো। সর্বত্রই বিদ্রোহীরা ইংরেজদের হত্যা করল, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিল আর সরকারী টাকা লুঠ করল।

মিরাটের ভয়াবহ কাণ্ডের সংবাদ চার দিন পরে এলাহাবাদে

পৌঁছয়। নগরের সর্বত্র এই নিয়ে আন্দোলন চলল। আর ইংরেজদের চোখের সামনে বিপ্লবের যে করাল ছায়া ফুটে উঠল, তাতে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। জনসাধারণের মধ্যেও প্রবল উত্তেজনা। ইংরেজরা তখন নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে এলাহাবাদের দুর্গে আশ্রয় নিল। কাশী থেকে এলাহাবাদে আসতে হলে এলাহাবাদের কাছাকাছি দারাগঞ্জের সামনে গঙ্গার একটা সেতু পার হয়ে আসতে হতো। কতকগুলো সিপাহীকে দুটো কামান দিয়ে এই সেতু রক্ষা করবার জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

এই সেতু ও সেনানিবাসের মাঝখানে থাকত একদল অশ্বারোহী সৈন্য। তারা যখন কাশীর খবর শুনল এবং শুনল সেনাপতি নীলসাহেবের নিষ্ঠুরতার কাহিনী, অমনি তারা প্রতিশোধ নিতে তৈরি হলো। এই সেনাপতি নীল সাহেব কাশী থেকে এলাহাবাদ আসবার সময়ে পথের দু'পাশের গ্রামের বহু নিরীহ লোককে ধরে ধরে ফাঁসি দিয়েছিলেন। আর তাদের ঘর-বাড়ি সব জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

এছাড়া যেসব সিপাহী তাদের নিজেদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের বাড়ি আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কাশীতে সামরিক আইন জারি করা হলো। এই আইনের অপব্যবহারে কাশীর লোকের দুর্দশা চরমে উঠল। অনেকের ফাঁসি হলো, পল্লীতে পল্লীতে নির্মম বেত্রাঘাত বেপরোয়াভাবে চললো। রাস্তার দুধারের গাছে গাছে ফাঁসি দিয়ে লোকের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হলো। ক'জন ছেলে সিপাহীদের পতাকা নিয়ে ও টম্‌টম্‌ বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে খেলা করতে করতে যাচ্ছিল। এই অপরাধে সামরিক বিচারালয়ের বিচারে তাদের প্রতি মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলো। কাশী থেকে এলাহাবাদ আসবার পথে সেনাপতি নীল প্রায় এক হাজার লোককে গুলি করে, আগুনে পুড়িয়ে ও ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছিলেন।

এই ভীষণ কঠোরতা কিন্তু বিদ্রোহের আগুনকে নিবিয়ে দিতে পারল না, বরং এর জ্বালাময়ী শিখা আরো লেলিহান হয়ে ভারতের আকাশ ছেয়ে ফেলল। বিদ্রোহের দাবাগ্নি এলাহাবাদেও ভীষণভাবে জ্বলে উঠল। ৬ই জুন রাত্রি ন'টার সময় হঠাৎ ভেরী বেজে উঠল, সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। যারা সেতু পাহারা দিচ্ছিল তারাই প্রথমে বিদ্রোহ প্রকাশ করে। তখনি একজন সেনাপতি বিদ্রোহ দমন করতে এসে নিহত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৈন্যদলও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। সিপাহীরা কামান দুটো নিয়ে কাওয়াজের মাঠে এল।

কেন কামান নিয়ে এলে?—জিজ্ঞাসা করলেন তাদের সেনাপতি কর্ণেল সিম্‌সন।

বিদ্রোহীরা গুলির মুখে কৈফিয়ৎ দিল। কর্ণেল সাহেব বেগতিক দেখে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। তিনি দুর্গে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু দুর্গের সিপাহীরাও বিদ্রোহী। কর্ণেল সিমসন দুর্গে ঢুকেই তাদের নিরস্ত্র করলেন। দুর্গের সিপাহীরা অস্ত্র পরিত্যাগ করে বাইরের বিদ্রোহীদের সঙ্গে এসে হাত মেলালো। এতে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে বিপ্লবের গতি। সারারাত ধরে চললো লুঠ। বিদ্রোহীরা জেলখানা ভেঙে কয়েদীদের ছেড়ে দিল। তারপর তারা এবং উন্মত্ত জনসাধারণ একসঙ্গে ছুটল ইংরেজদের বাংলোর দিকে। পথে যেসব ইংরেজকে তারা দেখতে পেল, তাদের মেরে ঘরবাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। রেলের কারখানা ধ্বংস হলো। টেলিগ্রাফের তার কেটে দিল। দুর্গের বাইরে যত ইংরেজ ছিল, বিদ্রোহীরা তাদের প্রায় সকলকেই মেরে ফেলল। কোনো দয়ামায়া দেখাল না।

পরের দিন ৭ই জুন দুপুর বেলায় সিপাহীরা ধনাগার থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা লুঠ করল। যেসব তালুকদারের কাছ থেকে তাদের জমিদারি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তারাও কোম্পানীর শাসনের শেষ হয়েছে মনে করে পল্লীর কৃষাণদের উত্তেজিত

করতে লাগল। লিয়াকৎ আলি নামে এক মৌলবীও মুসলমানদের মধ্যে ভীষণভাবে প্রচার করলেন কোম্পানী-বিদ্বেষ। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠল। এমনি করে নগরের বাইরে সুদূর পল্লীগ্রামেও জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল ঘোর অসন্তোষ আর বিদ্বেষ।

ঠিক এমনি সময়ে কাশী থেকে সসৈন্যে এলেন সেনাপতি নীল। তিনি এসে দুর্গের মধ্যে যেসব ইংরেজ নরনারী আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের সকলকে জাহাজে করে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন। তারপর এগার দিন ধরে ক্রমাগত চেষ্টা করে তিনি এলাহাবাদে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু তাঁর অত্যাচারের ফলে নগর জনশূন্য হলো। ভয় পেয়ে সকলেই ঘরবাড়ি ফেলে চারদিকে পালিয়ে গেল। শিখ সৈন্যরা নগরবাসীদের জিনিসপত্র লুঠ করতে লাগল আর যেখানে-সেখানে আগুন ধরাতে লাগল।

এলাহবাদে ইংরেজরা এমন ভীষণ প্রতিশোধ নিয়েছিল যে সেই কথা বলতে গিয়ে সেই সময়কার একজন ইংরেজ লিখেছেন: পথের ধারে ও বাজারে যে সব লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল, তাদের মৃতদেহ গঙ্গায় ফেলে দেবার জন্যে আটখানা গাড়ির দরকার হয়। তিন মাস ধরে এই গাড়িতে রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি ঐসব মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়। ছ'হাজার লোকের জীবন এইরূপে বিনষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলেই নির্ভীকভাবে প্রাণ দেয়—একটি লোকও ইংরেজের কাছে জীবন ভিক্ষা করেনি।

এলাহাবাদের যখন এই অবস্থা, তখন খবর এল—কানপুরের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। আটশো সৈন্য আর দুটো কামান নিয়ে কাপ্তেন রেণ্ডকে পাঠান হলো কানপুর উদ্ধারের জন্য।

॥ নয় ॥

মে মাসের মাঝামাঝি।

কানপুরের লোকজন প্রতিদিনের জীবনযাত্রা নিয়মিতভাবে করে চলেছে। এমন সময়ে আগ্রা থেকে একদিন খবর এল—মিরাটে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। হাটে-বাজারে সর্বত্র লোকের মুখে মুখে ঐ কথা—মিরাটে একটা ভীষণ কাণ্ড হয়েছে। কিন্তু সে ভীষণ যে কত ভীষণ, তা তাদের ধারণা ছিল না। দু'দিন পরেই আবার খবর এল—দিল্লীতে একটা সাংঘাতিক কাণ্ড হয়েছে। ১০ই মে সারারাত ধরে নাকি কামানের শব্দ শোনা গেছে।

তারপরেই একে একে মিরাটের তিন নম্বর ঘোড়সওয়ার পল্টনের সিপাহীদের বিদ্রোহের খবর থেকে শুরু করে দিল্লী-অবরোধের সমস্ত খবর এসে পৌঁছুল কানপুরে। সমস্ত সেনানিবাস চঞ্চল হয়ে উঠল। সকলের আগে উত্তেজনা দেখা দিল দু'নম্বর ঘোড়সওয়ার পল্টনের সিপাহীদের মধ্যে। সেনাপতি হুইলার প্রমাদ গণলেন। তবু ১৮ই মে তিনি কলকাতায় বড়লাটকে লিখলেন—ভয়ের কোন কারণ নেই। কানপুরের সিপাহীরা এখন পর্যন্ত শান্ত আছে।

প্রথম প্রথম যেখানে যেখানে যত ঘটনা হচ্ছিল, জেনারেল হুইলার তার কিছুই জানতে পারেন নি। মে মাস যতই শেষ হয়ে আসে, ততই চারদিক থেকে আসতে লাগল নানা রকমের দুঃসংবাদ। দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে নানা রকমের গুজব। মুখে মুখে গল্প। সিপাহীদের মনে আতঙ্ক—তাদের নাকি প্যারেডের মাঠে নিয়ে গিয়ে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হবে। মিরাট ও দিল্লীর খবর আসার কয়েকদিন পরে

সেনাপতি হুইলার ভাবলেন—ভালো করে বুঝিয়ে দিলে হয়ত সিপাহীদের মনের আতঙ্কভাব দূর হবে। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল, ততই তাঁর মনে হলো, এ-চেষ্টা বৃথা; কেননা, সিপাহীদের উত্তেজনার ভাব না কমে দিন দিন বেড়েই চলেছে। তিনি আরো বুঝতে পারলেন, কেবল সিপাহীরাই বিদ্রোহ ঘটাচ্ছে না, জনসাধারণও ইংরেজের ওপর বিরূপ।

কানপুরের ইংরেজদের নিরাপদে রাখার কথাই তিনি তখন প্রথমে ভাবলেন। কিন্তু আরো কিছু ইংরেজ-সৈন্য আনতে পারলে ভালো হতো। অস্ত্রাগারটির কথাও সেনাপতি একবার ভাবলেন। সেনানিবাসের উত্তর পশ্চিম সীমানায় এটি অবস্থিত। গোলাগুলি, বারুদ, বন্দুক ও কামান এখানে অজস্র আছে। সিপাহীদের হাতে এগুলো পড়লে রক্ষা নেই। এটাকে রক্ষা করতে পারলেই নিরাপদে সব ব্যবস্থাই করা যেতে পারবে, ভাবলেন বৃদ্ধ হুইলার। খুব উঁচু পাঁচিল দিয়ে অস্ত্রাগারটা ঘেরা। তার ছ'মাইল দূরে, গঙ্গার একটু দূরে, সিপাহীদের ছাউনির কাছেই ছিল হুটো হাসপাতাল, একখানা দোতলা বাড়ি, একখানা একতলা বাড়ি আর খানকতক চালাঘর। সেইখানে গোলন্দাজ সৈন্য রেখে, সেই জায়গাটিকে নিরাপদ রাখবেন বলে সেনাপতি ঠিক করলেন। তাহলেই ইংরেজরা এইখানে তাদের ছেলে-মেয়ে নিয়ে নির্বিঘ্নে থাকতে পারবে।

কিন্তু শুধু নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলে কি হবে, উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যেরও তো দরকার। কমিশেরিয়েট বিভাগের ওপর আদেশ দেওয়া হলো—বিপদের সময়ে ইংরেজরা যতদিন আশ্রয়-দুর্গের মধ্যে বাস করবে ততদিনের মতো খাবার জোগাড় করে দাও। কমিশেরিয়েটের কর্মচারীরা এবিষয়ে যত্ন নিলেন। কিন্তু চারদিকের যেরকম অবস্থা তাতে যত জিনিসের দরকার, তত জিনিস জোগাড় করা কঠিন হলো। চারদিকে মাটির

পাঁচিল তোলা হলো। তখন দারুণ গরমের দিন। মাটি শুকিয়ে শক্ত হয়ে গিয়েছে। বেশী মজুরী দিয়ে সেই কাজ করান হলো।

অস্ত্রাগারটাকে নিরাপদে রাখার কথাও ভাবলেন হুইলার। সকলের আগে এইটাই দরকার। কিন্তু তা ঠিকভাবে করবার আর সময় পাওয়া গেল না, তার আগেই চারদিক থেকে বিদ্রোহের ডঙ্কা শোনা গেল। ন'বিঘে জমির ওপর মজবুত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই অস্ত্রাগারের মধ্যে অজস্র যুদ্ধের অস্ত্র মজুত ছিল। দিল্লীর অস্ত্রাগার উড়ে গেছে, কানপুরের ভবিষ্যৎ কি, সেনাপতি একবার তা কল্পনা করলেন।

এইসব ব্যবস্থা করে সেনাপতি লক্ষৌতে স্যার হেনরী লরেন্সকে এক চিঠিতে লিখলেন—এখানে শিগ্‌গীর বিদ্রোহ হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অতএব আপনি কিছুদিনের জন্য লক্ষৌ থেকে কিছু ইংরেজ সৈন্য এখানে পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু তখন অযোধ্যায় গোলমাল, তবু লরেন্স চব্বিশজন গোরা সৈন্য কানপুরে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে গেলেন কাপ্তেন ফ্লেচার হেজ্। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দারুণ গ্রীষ্মে পুড়তে পুড়তে তৃষ্ণায় শুষ্ক কণ্ঠ হয়ে কাপ্তেন সন্ধ্যার একটু আগে কানপুরে এসে পৌঁছলেন।

যে সময়ে তিনি স্যার হেনরী লরেন্সের কাছে সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সেনাপতি হুইলার আর এক-জনের কাছ থেকে সাহায্য চাইলেন। তিনি তাঁর নিকট প্রতি-বাসী, বিঠুরের রাজা নানাসাহেব।

নানাসাহেব এর আগে নগর-ভ্রমণের ছল করে লক্ষৌ গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি যথাসময়ে তাঁর রাজধানী বিঠুরে ফিরে এসেছেন। লক্ষৌ হলো অযোধ্যার রাজধানী। সেই রাজধানীর এবং সারা অযোধ্যার লোকের মনের ভাব কি রকম, তা ভালো করেই তিনি জেনে এসেছেন। জেনে

এসেছেন—সমস্ত সিপাহীদলে অসন্তোষ আর সমানভাবে ভয় দেখা দিয়েছে। এ সবই বিপদের সংকেত। সেই সংকেত কেবল অযোধ্যায় নয়, উত্তর-ভারতের সব জায়গায় বিদ্রোহের আগুন প্রধূমিত। ইংরেজের প্রতি তাঁর বিষম বিদ্বেষ; নানাসাহেব তাই মনে করলেন, এত দিন যে শুভ দিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, তা বুঝি আজ এল।

সেদিন বিঠুর প্রসাদে নানাসাহেব ও তাঁর দুই ভাই যখন বসে কানপুরের অবস্থা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন, তখন সেনাপতি হুইলারের দূত এল নানাসাহেবের কাছে। যদিও কিছুকাল আগে তিনি যখন হঠাৎ লক্ষ্ণৌ বেড়াতে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার কমিশনার মিষ্টার গাবিনস কানপুরে সেনাপতি হুইলারকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, বিঠুরের রাজাকে তিনি যেন খুব বেশী বিশ্বাস না করেন। সে কথা হুইলারের মনে ছিল, তবু উপস্থিত বিপদের সময়ে তিনি নানার কাছ থেকে সাহায্য না চেয়ে থাকতে পারলেন না। হুইলারের চিঠিখানা বাবাভট্টের হাতে দিয়ে নানাসাহেব বললেন—হুইলার সাহেব কি লিখেছেন, দেখ তো?

বাবাভট্ট চিঠিখানা পড়লেন:

"উপস্থিত বিপদের সময়ে আপনাকে আমাদের বন্ধু মনে করেই আমি আপনার সাহায্য চাইছি। যদি একবার কানপুরে আসেন তা হলে আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করতাম।"

বালরাও, তুমি কি বল?—জিজ্ঞাসা করলেন নানা সাহেব।

—দাদা, আমার মতে ইংরেজকে সাহায্য করা ঠিক নয়।

—বাবাভট্ট, তুমি কি বল?

—আমি বলি, হুইলারকে আপনি লিখে দিন যে, কতকগুলো শর্তে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে পারি।

যথা?—জিজ্ঞেস করলেন নানাসাহেব।

—কোম্পানী আপনাকে পেশবা বলে স্বীকার করবে; তার

পর বাবা যে বৃত্তি পেতেন, কোম্পানী আপনাকে সেই বৃত্তি দেবে।

এমনসময়ে আজিমউল্লা এসে উপস্থিত।

আজিম একটা খবর আছে—বললেন নানাসাহেব।

কি খবর ?—জিজ্ঞাসা করেন আজিমউল্লা।

—হুইলার সাহেব আমার সাহায্য আর পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখেছেন। বালরাও ও বাবাভট্টকে বলছিলাম তাদের কি মত। এখন শুনি তোমার কি মত ?

—আমার মত আর তোমার মতের মধ্যে কি কোনো তফাৎ আছে ? এই তো আমাদের কার্যসিদ্ধির সুযোগ। বলতে বলতে চোখ দুটো প্রতিহিংসায় জ্বলে ওঠে আজিমউল্লার।

—ঠিক বলেছ আজিম, আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। ঐ স্তূপীকৃত কাগজগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ বালরাও : আমার, শুধু আমার বলি কেন, সমস্ত মারাঠার অপূর্ণ মনোরথের করুণ ইতিহাস লেখা আছে ওগুলোর মধ্যে। আমার নৈরাশ্যের কথা কে না জানে ? সে নৈরাশ্যের খবর কি কলকাতা থেকে ইংলণ্ডে যায়নি ?, সে খবর কি ইংলণ্ড থেকে কলকাতায় ফিরে আসেনি ? আবার কি সেই নৈরাশ্যের খবর কলকাতা থেকে কানপুর পৌঁছয়নি ? দিস্তে দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ ভর্তি করে কি সেই নৈরাশ্যের খবর লিপিবদ্ধ হয়নি ? আমার সম্বন্ধে ইংরেজরা যে বিচার করেছেন, সে বিচার নয়—অবিচার। ইংরেজ কি মনে করে, নানাসাহেব তাদের অনুগত ভক্ত হয়ে থাকবে ? কোম্পানী এখন বিপাকে পরে আমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু নানাসাহেবের বন্ধুত্বের জন্যে তাদের যে কী দাম দিতে হবে, সে কথা ইংরেজ শিগ্‌গীরই বুঝতে পারবে।

বলতে বলতে নানাসাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তার

পর মৃদু হাস্য করে বললেন—আজিম, তুমি হুইলারের দূতকে লিখে দাও, আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব।

কানপুরের কলেক্টর মিষ্টার হিলার্সডন্ পরের দিন বিঠুরে এসে নানাসাহেবের সঙ্গে আলোচনা করলেন। নানাসাহেব তাঁকে শিষ্টাচারের সঙ্গেই অভ্যর্থনা করলেন। এই বিপদের সময়ে গভর্ণমেণ্টের ধনাগার নিরাপদে রাখাই ছিল কালেক্টরের প্রধান চিন্তার বিষয়। সরকারী টাকার ওপরেই বিদ্রোহীদের লোভ। কেউ কেউ বলেছিলেন যে, সেনানিবাসের মধ্যে রাখলে ধনাগার নিরাপদে থাকবে। বিঠুরের রাস্তার অল্প দূরে কানপুর ট্রেজারী। সেখান থেকে ছাউনি অনেক দূর। এখন ধনাগার সরিয়ে নেবার সময়ও নেই। কালেক্টর সাহেব তাই নানা সাহেবের কাছে প্রস্তাব করলেন: আপনি এটা রক্ষা করবার ভার নিন।

নানাসাহেব হেসে বললেন—বেশ তাই নেবো।

অবিলম্বে নানাসাহেবের দু'শো অস্ত্রধারী অনুচর দুটো কামান নিয়ে নবাবগঞ্জে এসে আড্ডা করল। ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার রক্ষার ভার নানাসাহেবের ওপর দেওয়া হলো। বিদায় নেবার আগে কালেক্টর নানাসাহেবকে অনুরোধ করলেন—কানপুরের সিপাহীরা যে কোন সময়ে বিদ্রোহ করতে পারে বলে হুইলার আশঙ্কা করছেন। কাজেই এই বিপদের সময়ে আপনি যদি আপনার সৈন্য ও কামান নিয়ে কানপুরে আমার বাড়িতে এসে বাস করেন, তাহলে খুব ভাল হয়। আমরা একটু ভরসা পাই।

নানাসাহেব এই প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনি একশো সিপাহী, তিনশো বন্দুক ও দুটো কামান নিয়ে বিঠুর থেকে কানপুরে চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁতিয়া তোপিও এলেন। বন্ধুত্বের মুখোস পরে তিনি শত্রুতা সাধনে অগ্রসর হলেন।

২২শে মে। রাত একটা।

সেনাপতি হুইলারের কাছে চারদিক থেকে নানা রকম খবর আসতে লাগল।

সকালে উঠে তিনি শহরের যে দৃশ্য দেখলেন, সেরকম দৃশ্য ভারতবর্ষে এসে অবধি তিনি আর কখনো দেখেননি। ইংরেজ সৈন্যদের ব্যারাকে বেবন্দোবস্ত, বিশৃঙ্খলা, চারদিকে গোলমাল, আর আতঙ্ক। চারটে কামনে গোলাবারুদ ভর্তি ছিল। গোলন্দাজেরা কাছেই দাঁড়িয়েছিল। তাদের মাথায় নাইট-ক্যাপ, কোমরে তরবারি। দলবেঁধে তারা চুপ করে কামানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। নানা বর্ণের নানা ব্যবসায়ের ও নানা ধর্মের লোকেরা ব্যারাকের ভেতরে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। শহর থেকে ছাউনির দিকে আসছে বগীগাড়ি, পাল্কী-গাড়ী ও আরো নানারকমের গাড়ি। নানা আকারের নানা প্রকারের অসংখ্য লোক সেইসব গাড়ি থেকে নামতে লাগল। শাদা, কালো, কটা, সকল রঙের মানুষের ভীড়। সকলের মুখে অজানা শত্রুর আক্রমণের ভয়ের চিহ্ন।

মেমসাহেবেরা ব্যারাকের কদর্য টেবিলে খানা খেতে বসেছিল, ধাইরা ছোট ছোট ছেলেদের স্তন পান করাচ্ছিল, চারদিকে আয়া, চারদিকে ছেলেমেয়ে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে অফিসারেরা পর্যন্ত শশব্যস্ত। বাজারের দোকানপাট সব বন্ধ। ভয়ানক ভয়ানক জনরব শুনে চার পাঁচবার জেনারেল হুইলারের দাঁতকপাটি লাগছিল। চারদিক থেকে লোকেরা ছুটে এসে তাঁর কাছে যেসব অসম্ভব গল্প বলছিল, তা যেমন অদ্ভুত, তেমনি ভয়ঙ্কর। দশ মিনিটের মধ্যে অন্য দল এসে সেইসব গল্প মিথ্যা বলে প্রমাণ করে; আবার আর এক দল এসে ভয়ঙ্কর জনরবকে আরো বেশী ভয়ঙ্কর করে রঙ চড়াল। পরের দিনও সারাদিন ঠিক এই রকম অবস্থা।

দেশীয় লোকদের সাহেবরা বুঝিয়ে দেয় যে, ভয়ের কোন

কারণ নেই। কিন্তু ভরসাও নেই। ব্যারাকে সিপাহীরা অশান্ত হয়ে উঠেছে। তাদের শান্ত করার ক্ষমতা একমাত্র জেনারেল হুইলারের। হুইলারের চোখে ঘুম নেই। ব্রিগেডিয়ার জ্যাক, ক্যাণ্টনমেণ্টের ম্যাজিষ্ট্রেট পার্কার আর জজ অ্যাডভোকেট উইগ সবাই উদ্বিগ্ন।

২৪শে মে মুসলমানদের ইদ্। হু'নম্বর ঘোড়শওয়ার রেজিমেণ্টের সকল সিপাহীই ছিল মুসলমান। কানপুরে তখন মুসলমানদের প্রভাব খুব বেশী। মুসলমানেরা সুবিধা পেয়ে শহরের লোকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছিল। তাই ইদের দিন ইংরেজদের ভয় হলো যে হয়ত মুসলমানেরা একটা হাঙ্গামা বাধাবে। কিন্তু সে দিনটাও নির্বিঘ্নে কেটে গেল। ইদের দিন হিন্দু-মুসলমানে গলাগলি ধরে কানপুরের পথে শোভাযাত্রা করে বেড়াল। সে কী উদ্দীপনা তাদের!

সেনাপতি আদেশ দিলেন, সব ইংরেজকে মাটির পাঁচিল-ঘেরা জায়গায় আত্মরক্ষার জন্য যেতে হবে। এদিকে শহরে নানা রকমের ভীষণ জনরব প্রবল হয়ে উঠেছে। কাজে কাজেই ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেমসাহেবরা খুব ব্যস্ত হয়ে সেই খানে গিয়ে আশ্রয় নিলো। মাটির পাঁচিলের ওপর কতকগুলো কামান রাখা হলো।

ইংরেজরা একজায়গায় গিয়ে জড়ো হচ্ছে দেখে সিপাহীদের মনে সন্দেহ হলো। সন্দেহ থেকে এলো অবিশ্বাস। আবার কোন কোন সিপাহী মনে করল-ইংরেজেরা ভয় পেয়েছে। কেউ কেউ মনে করল সিপাহীদের ভয় দেখাবার জন্যই এই আয়োজন। সিপাহীদের বিশ্বাস টলে গেল, তাদের মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল অবিশ্বাস। সেনাপতি হুইলার তাদের ডেকে বললেন—আমি বাহান্ন বছর ধরে সেনাদলে কাজ করছি, তোমরা আমাকে ভালো রকমেই জানো। আমার কথা শোনো, টোটার মধ্যে চর্বি নেই। আর যদি তোমাদের মনে এই

সন্দেহই হয়ে থাকে যে চর্বি-টোটা তোমাদের কাছে অস্পৃশ্য তাহলে সেই টোটা তোমাদের আর দেওয়া হবে না। তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর। গুজবে কান দিও না।

মে মাস কেটে গেল।

দু'নম্বর অশ্বারোহীদলের সুবাদার টিকাসিংহ ২রা জুন সন্ধ্যাবেলায় নবাবগঞ্জে এলেন নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। নানাসাহেব সামসুদ্দীন খানের মারফৎ আগেই খবর পেয়েছিলেন। তিনি তৈরি হয়েই ছিলেন। টিকাসিংহ আসতেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নানাসাহেব তাঁকে নিয়ে গঙ্গার ধারে এক নিরিবিলি জায়গায় এলেন। সঙ্গে ছিল তাঁর ভাই বালারাও। গঙ্গার ওপরে নৌকা তৈরি ছিল। সকলে গিয়ে নৌকায় উঠলেন। প্রথমেই টিকাসিংহ নানাসাহেবকে বললেন—আপনি ইংরেজদের অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষার ভার নেবার জন্যে এখানে এসেছেন। কিন্তু আমরা হিন্দু-মুসলমান সবাই আমাদের ধর্মরক্ষার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছি, সব সিপাহীই এ বিষয়ে একমত। আপনি কি বলেন?

সিপাহীদের যে মত, আমারও সেই মত—বললেন নানাসাহেব।

তারপর দুজনার মধ্যে অনেকক্ষণ মন্ত্রণা হলো। তবে এই মন্ত্রণার কথা ইংরেজরা কিছুই জানতে পারল না। কিন্তু কানপুরের সিপাহীরা বুঝল, নানাসাহেব বিদ্রোহীদের পক্ষে আছেন, টাকা ও সৈন্য দিয়ে তিনি তাদের সাহায্য করবেন। টিকাসিংহ যখন বিদায় নিয়ে চলে আসবেন, তখন নানাসাহেব তাঁকে বললেন—দেখুন সুবেদার সাহেব, হুইলার বা আর কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায় যে আমি বিদ্রোহীদের পক্ষে আছি। বাইরে আমি তাদের বন্ধু, ভেতরে দুষমন।

৩রা জুন, রাত নটা। সেনাপতি হুইলারের বাংলো। কলকাতায় বড়লাটের কাছে সেনাপতি শেষবারের মত কানপুর

থেকে খবর পাঠাচ্ছেন : "আগ্রা ও কানপুরের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বাসগৃহ পরিত্যাগ করে আমি এখন নতুন আশ্রয়স্থানে সবাইকে নিয়ে বাস করছি; যতদিন না পুরোপুরি শান্তি স্থাপন হয়, ততদিন আমি এইখানেই থাকব। এখানকার সিপাহীদের মধ্যে অবিশ্বাস ও উত্তেজনার ভাব কমে এলেও পূর্ণমাত্রায় কমছে না। আমরা যা কিছু ভালো মনে করছি, সিপাহীরা তাতেই সন্দেহ করছে। তবে সিপাহীরা আমাকে ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তাই কানপুরে বিদ্রোহ নিবারণে আমি সক্ষম হব, আশা রাখি। কিন্তু আমার সৈন্য সংখ্যা কম; কারণ লক্ষ্ণৌয়ের জন্যে আমি এখান থেকে পঞ্চাশ জন পদাতিক সৈন্য ও দু'জন অফিসার পাঠিয়ে দিলাম।"

৪ঠা জুন। রাত দুটো। লোকজন সব নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে। সকলকে চকিত করে মাঝ রাতের অন্ধকারে বন্দুকের ঘন ঘন আওয়াজ শোনা গেল—আর অমনি চারদিকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। সকলেই বুঝল কানপুরের সিপাহীরা বিদ্রোহী হয়েছে। দু-নম্বর অশ্বারোহীদল ও এক নম্বর পদাতিকদলের সৈন্যরাই প্রথম কানপুরে বিদ্রোহের পতাকা ওড়াল। একজন সুবাদার তাহাদিগকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু উন্মত্ত সিপাহীরা তাকে তরবারির আঘাতে কেটে বেরিয়ে এলো। পদাতিকদলও তাদের অনুসরণ করল। সকলে মিলেই ছুটল নবাবগঞ্জের ধনাগার, কারাগার ও অস্ত্রাগারের দিকে।

নবাবগঞ্জের কাছাকাছি এসে সেই দুই দলের সিপাহীরা নানাসাহেবের সৈন্যদের সঙ্গে মিলল। তারা তৈরী হয়েই ছিল। সকলে মিলে ধনাগার লুঠ করল, জেলখানার লোহার কবাট ভেঙে কয়েদীদের ছেড়ে দিল, এবং অস্ত্রাগারে ঢুকে কামান, বন্দুক ও বারুদ ইত্যাদি দখল করল। আর শেষে কোম্পানীর কাগজপত্র সব পুড়িয়ে দিল। মাটির দুর্গের মধ্যে বসে সেনাপতি হুইলার এই বিদ্রোহের খবর পেলেন।

॥ দশ ॥

কানপুরে বিদ্রোহের ভেরী বেজে উঠল।

নবাবগঞ্জের প্রাসাদে বসে নানাসাহেব আজিমউল্লাকে বললেন—ছাউনীর আর সব সিপাহীদের খবর কী ?

আজিমউল্লা বললেন—তু'দল সিপাহী এখনো পর্যন্ত বিদ্রোহে যোগ দেয়নি, শুনলাম। তারা এখনো নাকি কোম্পানীর অনুরক্ত আছে।

—তাদের সম্বন্ধে হুইলারের মনোভাব কি রকম ?

—খুবই সন্দিগ্ধ।

—কিন্তু সমস্ত সিপাহীদেরই তো যোগ দেবার কথা। তুমি ঠিক জানো ?

—হ্যাঁ, আমি একটু আগেই হুইলারের সঙ্গে কথা বলে জেনে এসেছি।

—লক্ষ্ণৌ-এর খবর কি ?

—সেখান থেকে আপাতত কোন সাহায্য এখানে আসার উপায় নেই।

—এখানে ইংরেজ সৈন্য কত ?

—অতি সামান্য।

—আমরা তুর্গ অবরোধ করার পর, ওরা কতদিন যুঝতে পারবে মনে কর ?

—যতদিন রসদ আছে।

—কতদিনের রসদ হুইলার সংগ্রহ করতে পেরেছেন ?

—কমিসেরিয়েট থেকে খবর পেলাম পুরো এক মাসের মত রসদও যোগাড় করা সম্ভব হয় নি।

—হুইলারের মনে আমার সম্বন্ধে কোন সন্দেহ জাগেনি তো ?

—না, তাঁর ধারণা তুমি এখনো ইংরেজদের পক্ষেই আছো। তুমি তাদের বন্ধু।

—কিন্তু সময় তো এলো, এবার আমাকে মুখোস খুলতে হবে। বালারাও আর বাবাভট্ট কোথায়?

—বিঠুরে গেছেন। সেখানকার প্রাসাদ রক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে কিনা দেখবার জন্যে।

—তাঁতিয়া তোপি কোথায়?

—তিনি কয়েকজন বিদ্রোহীকে নিয়ে কানপুর-লক্ষ্ণৌ সড়কটা দেখতে গেছেন।

নানাসাহেব ও আজিমউল্লার আলোচনা শেষ হবার আগেই এক গুপ্তচর এসে সংবাদ দিল যে, কানপুর ছাউনির তিপ্পান্ন ও ছাপ্পান্ন নম্বর পলটনের সিপাহীরাও বিদ্রোহী হয়েছে।

নানাসাহেব এই খবর পেয়ে উল্লসিত হলেন।

বিদ্রোহী সওয়ার সিপাহীরা যে যে জিনিস লুঠ করেছিল, হাতীর পিঠে ও গরুর গাড়ীতে তারা সেগুলো বোঝাই করে রাখে; পরে সেইসব জিনিস নিয়ে দিল্লী যাবে, এই তাদের মতলব ছিল। কিন্তু আর দু'দল সিপাহী কোথায়? নবাবগঞ্জের সিপাহীরা সন্দেহ করছিল, ইংরেজের সিপাহীরা সত্যি সত্যি তাদের সঙ্গে মিলিত হবে, কি না। ৫ই জুন সকাল পর্যন্ত তিপ্পান্ন ও ছাপ্পান্ন নম্বর পলটনের সিপাহীরা তাদের অন্যান্য সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দেবার লক্ষণ দেখায় নি।

সেদিন বেলা দুপুরেও তারা যথারীতি প্যারেড করল। তারপর ছুটি পেয়ে সিপাহীরা, ইউনিফর্ম ছেড়ে অন্য কাপড় পরে খাবার উদ্যোগ করে। ইংরেজ অফিসারেরা তখন কেউ কেউ মাটির দুর্গে, কেউ তাঁদের নিজেদের বাংলোয় চলে গেলেন। এমন সময় দু'নম্বর ঘোড়সওয়ার পলটনের কয়েকজন বিদ্রোহী সিপাহী তাদের উস্কানি দেবার জন্য সেখানে এসে হাজির হলো। তারা এসে বলল—দেরী হলেই সব মাটি হয়ে যাবে।

তারপর নিশ্চিন্ত মনে সিপাহীরা খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করছে, এমন সময়ে সেনাপতি তাদের ওপর কামানের গোলা ছুঁড়তে হুকুম দিলেন।

দ্রুম্! দ্রুম্! দ্রুম্!

তিনবার তোপ দাগা হলো।

সিপাহীরা খাবার জিনিস ফেলে দল বেঁধে ছুটল নবাবগঞ্জের দিকে। সেখানে গিয়ে তারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিল। তারা এসে নানাসাহেবকে 'রাজা' বলে অভিবাদন করল এবং তাঁর নামেই সব কাজ করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল।

লর্ড ডালহৌসি নানাসাহেবের ওপর যে অবিচার করেছিলেন, তাঁকে যেভাবে পৈতৃক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন, তা তখন একে একে তাঁর মনে পড়তে লাগল। তিনি সিপাহীদের আশ্বাস দিয়ে বললেন,—এইবার কোম্পানীর মুল্লুক খতম করতে হবে।

কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহীরা ঠিক করেছিল যে, তারা দিল্লী গিয়ে সেখানকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে মিলে বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করবে। তারা উল্লাসের সঙ্গে নানাসাহেবকে তাদের অধিনায়ক পদে বরণ করল। তাদের টাকা ছিল, অস্ত্রশস্ত্র ছিল, যানবাহন ছিল, আর দিল্লীর বাদশাহীমহল থেকে আরো অনেক সাহায্য পাবে, এমন আশাও ছিল। নবাবগঞ্জের বাড়িতে এই নিয়ে নানাসাহেবের সঙ্গে বিদ্রোহীদের অনেক আলোচনা হলো। শেষে আজিমউল্লা বললেন—আমার মতে দিল্লীতে সবাই জমা হওয়া ঠিক নয়, তার চেয়ে এখানে থেকে আমরা অনেক কাজ করতে পারব।

মিরাটের বিদ্রোহীরা যেমন দিল্লী গিয়েছে, কানপুরের বিদ্রোহীরাও তেমনি সেখানে যেতে চাইল। তাই তারা আজিমউল্লার কথা শুনতে চাইল না। নানাসাহেবকে বলল—আমাদের সঙ্গে আপনি দিল্লী চলুন।

নানাসাহেবের হাতে বিদ্রোহীরা তখন লুঠের তিন লাখ টাকা তুলে দিয়েছে। তাঁতিয়া তোপিকে তখন নানাসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি বলেন ?

তাঁতিয়া তোপি বললেন—আমি দিল্লী যাওয়ার পক্ষপাতী নই, তবে বিদ্রোহীরা যে রকম উত্তেজিত দেখছি, তাতে মনে হয় ওদের কথায় রাজী হওয়াই ভাল।

তখন নানাসাহেব মনে মনে একটা উপায় ঠিক করলেন কিন্তু মুখে সেকথা প্রকাশ করলেন না। তিনি বিদ্রোহীদের সঙ্গে দিল্লী যেতে রাজী হলেন।

কানপুর থেকে তিন ক্রোশ দূরে কল্যাণপুর, সেখানে পৌঁছেই সন্ধ্যে হয়ে গেল। নানাসাহেব তখন বিদ্রোহীদের বললেন—বেলা শেষ হয়ে এসেছে। আজ রাতে এইখানে আমরা বিশ্রাম করি, কাল সকালে আবার যাত্রা করা যাবে।

সিপাহীরা রাজী হলো। আপাততঃ সেখানেই আড্ডা করা হলো। সকাল হতেই সিপাহীরা নানাসাহেবকে বললে—এবার দিল্লী চলুন।

—কিন্তু কাল রাতে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম যে, কানপুরে আমরা সমস্ত ইংরেজদের মেরে ফেলেছি, তারপর লক্ষ্ণৌ গিয়ে আমরা রেসিডেন্সী অবরোধ করেছি। দিল্লীতে বিদ্রোহীরা যা করতে পেরেছে, তার চেয়েও শতগুণে বেশী আমরা করেছি কানপুর আর লক্ষ্ণৌতে। উত্তর ভারতে আমরা কোম্পানীর মুল্লুক একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি। শেষ রাতে এই স্বপ্ন দেখেছি, আমার ধারণা এ স্বপ্ন সত্যি হবেই।

ভাইসব চলো, আমরা কানপুরে ফিরে যাই। কানপুরের দুর্গ জয় করেই আমরা বাদশাহকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করব। কানপুরকেই আমরা সারা হিন্দুস্থানের বিদ্রোহের কেন্দ্র করে তুলব। হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, মারাঠার নয়, একমাত্র ভারতবাসীর স্বাধীনতার পতাকা

আমরা কানপুর দুর্গের চূড়ায় তুলব। ভাইসব আর দেরি নয়, চলো আমরা কানপুরে ফিরে যাই।

এমন দৃপ্ত ভঙ্গিতে নানাসাহেব এই কথাগুলো বললেন যে, সিপাহীরা তা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলো। তারপর তারা বন্দুক কাঁধে নিয়ে কানপুরের দিকে মুখ ফেরাল।

কুইক্ মার্চ! লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্—হুকুম দিলেন নানাসাহেব।

—চলুন তবে, কানপুরে গিয়েই আমরা যুদ্ধ করব। লেফট্ রাইট্, লেফট্ রাইট্—বিদ্রোহীরা ছুটল আবার কানপুরের দিকে। তাদের চোখে ফুটে উঠল হিংস্র সংকল্প। পায়ের আওয়াজে কেঁপে ওঠে হিন্দুস্থানের মাটি।

কানপুর ছেড়ে নানাসাহেব আর দিল্লী গেলেন না। ভাবলেন, সেখানে গেলে হয়ত নিজের প্রভুত্ব তেমন খাটাতে পারবেন না, যেমনটা তিনি পারবেন এখানে। কানপুরে থাকলে তাঁর মান-মর্যাদা রক্ষা করে প্রাধান্য বজায় রাখতে পারবেন। ইংরেজদের দুর্বলতা তিনি তখন বেশ বুঝতে পেরেছিলেন। কানপুরের চারদিকে তাদের সর্বগ্রাসী বিপদ। লক্ষ্ণৌ-এর চারদিকেও বিপদ, সেখান থেকে যে কোন সাহায্য আসবে, তেমন আশা করা যায় না। কাশী, এলাহাবাদ ও আগ্রা থেকেও হুইলারের কোনরকম সাহায্য পাবার আশা নেই, এসবই নানাসাহেব জানতেন।

তাছাড়া, চার পল্টন সুশিক্ষিত সৈন্য, তাঁর নিজের বিঠুর সৈন্য, অজস্র কামান বন্দুক, প্রচুর যুদ্ধের সরঞ্জাম, প্রচুর টাকা —এসবই তাঁর সহায়। এ দিয়ে তিনি কানপুরে বসে কি না করতে পারেন? পেশবার পদ যদি এখন নাও উদ্ধার করতে পারেন, যেরকম সুযোগ এসেছে,তাতে দু'দিন বাদে তা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে, এই চিন্তা করলেন নানাসাহেব। আজিমউল্লা তাঁকে বলেছেন, ইউরোপেও ইংরেজদের পরাক্রম কমে আসছে।

ইংরেজের অধিকৃত যেসব রাজ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলেছে, তাতে ইংরেজ সৈন্যরা দিনের পর দিন কাহিল হয়ে পড়বে, এও তাঁর মনে হলো। যুদ্ধ বাধাবার এই তো সুযোগ! কার্য-কৌশল সবই তাঁর হাতে। এক আঘাতেই মারাঠার উচ্চ আশা ও বিদ্বেষের প্রতিশোধ চরিতার্থ হতে পারবে কানপুরে বসেই। নানাসাহেব তাই কানপুর ছেড়ে দিল্লী যেতে রাজী হলেন না।

৬ই জুন, শনিবার। সকালবেলা।

সেদিন সকালে হুইলার নানাসাহেবের কাছ থেকে এক-খানা চিঠি পেলেন। চিঠিখানা পড়ে বৃদ্ধ সেনাপতি চমকে উঠলেন। চিঠিতে লেখা ছিল যে, নানাসাহেব শিগগীর ইংরেজদের আত্মরক্ষার স্থান আক্রমণ করবেন। হুইলার বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, নানাসাহেব ইংরেজের শত্রু হবেন। কিন্তু চিঠিতে তো তাঁরই স্বাক্ষর। তবে কি বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী চলে যায় নি! তিনি ভাবছিলেন এই সুযোগে তিনি স্বচ্ছন্দে এলাহাবাদ চলে যেতে পারবেন। বৃদ্ধ সেনাপতির সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

এমন সময় একজন ইংরেজ অফিসারের কাছে হুইলার জানতে পারলেন যে, দিল্লীর পথ থেকে বিদ্রোহীরা কানপুরে ফিরে এসেছে। নানাসাহেবই তাদের ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর সৈন্যরাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাদের বল ও সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে। এইবার তারা নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে নতুন পরাক্রমে ইংরেজদের আক্রমণ করবে। হুইলারের অন্তরে আঘাত লাগল। অফিসার ও সৈন্যদের বীর হৃদয় কেঁপে উঠল। দুর্গের ভেতরে মেয়েরা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়ল। আর সময় নষ্ট করবার সময় রইল না।

ইংরেজ শিবিরে সাড়া পড়ে গেল। সমস্ত ইংরেজকে একত্র হবার হুকুম জারী হলো।

মাটির দেয়াল, সেই দেয়ালের মধ্যে আশ্রয় নেবার জায়গা। হাজার লোক এসে তার মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। দেয়ালের যেখানে যেখানে যে যে অস্ত্র রেখে পাহারা দেওয়া দরকার, তা হুইলারের আদেশে ঠিক হয়ে গেল। কামানগুলো গোলা দিয়ে ভর্তি করা হলো। পদাতিকরা সঙ্গীনযুক্ত গুলিভরা বন্দুক নিয়ে দাঁড়াল, গোলন্দাজেরা পাঁচিলের বাইরে কামানে আগুন দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইল। প্রত্যেক সমর্থ ইংরেজকেই অস্ত্র ধরতে হলো।

বিপক্ষ শিবিরেও সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

বিদ্রোহীরা দলে দলে ইংরেজদের আশ্রয়দুর্গের চারদিকে জমা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সুবেদার টিকাসিংহকে ঘোড়সওয়ার দলের জেনারেল করা হয়েছে। জমাদার দলগঞ্জন সিংহ ও গঙ্গাদীন সিংহকে কর্ণেল উপাধি দিয়ে পদাতিক দলের সেনাপতি করা হয়েছে। একদল বিদ্রোহী নগরে ও ছাউনির মধ্যে ঢুকে লুটপাট করতে আরম্ভ করল। সেখানে যেসব নিরাশ্রয় ইংরেজ তাদের চোখে পড়ল, তারা তাদের গুলি করে মেরে ফেলল, কোন দয়ামায়া দেখাল না?

একজন ইংরেজ সদাগর, তার বৌ, ষোল বছরের একটি ছেলে ও একটি ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে ডাক বাংলোর কাছে এক বাড়িতে লুকিয়ে ছিল। বিদ্রোহীরা সেই বাড়ির সামনেই তাদের গুলি করে মারল। খালধারের একখানা বাড়িতে চারজন ইংরেজ কেরাণী আশ্রয় নিয়েছিল, বিদ্রোহীরা তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল; তারা যেমনি পালাতে যাবে অমনি বিদ্রোহীরা তাদের গুলি করে মেরে ফেলল। তাদের মুখ থেকে কেবলই ধ্বনিত হচ্ছে—ফিরিঙ্গী লোককো মারো।

আশ্রয়-দুর্গের মধ্যে ইংরেজরা বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রতীক্ষায় প্রতিটি মুহূর্ত্ত গুণছে। কিন্তু বিপক্ষের কোনো

সাড়াশব্দ নেই। বেলা দুপুর। তখন কামানের প্রচণ্ড আওয়াজ শোনা গেল। ন'পাউণ্ডের একটা গোলা এসে শিবিরের মধ্যে পড়ল, ব্যারাকের বাইরে যারা ছিল গোলার চোটে তারা এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল। তার পরেই ভেরী বেজে উঠল। হুইলার ভাবলেন বিপাহীরা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে। ইংরেজ সৈন্যরা তৈরি হলো। বেলা যতই শেষ হয়ে এল, ততই ঘন ঘন বিদ্রোহীদের গোলাবৃষ্টি হতে লাগল। বিবিদের ও শিশুদের অবিরাম কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। সেদিন ওই পর্যন্ত।

পরের দিন। বিদ্রোহীরা পরদিন দুর্গ ঘিরে ফেলল। এক হাজার ইংরেজ নর-নারী আর শিশু অবরুদ্ধ হলো। প্রাণের ভয়ে তারা সবাই কাতর। সে-ভয় দূর হবার আশাও অল্প। তার ওপর অসহ্য সূর্যের তাপ। জুন মাসের আকাশে যেন আগুনের চাঁদোয়া টাঙ্গানো; সেই সঙ্গে বইছে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বায়ু। বন্দুকের নলগুলো তেতে আগুন হয়ে আছে, স্পর্শ করে কার এমন সাধ্য। এইভাবে ভারতের প্রখর সূর্যের তাপে ইংরেজ বীরদের শক্তি কমে আসে। নিস্তেজ হয় তাদের উদ্যম।

একটু সুশীতল ছায়ার তলায় শুয়ে থাকবার জন্যে মেয়েদের কত না আগ্রহ। গরমে যাতে তাদের গা পুড়ে না যায়, সেজন্য তারা সাধ্যমত তার উপায় করতে থাকে। এখন তারা সকালে ও সন্ধ্যায় দু'বার করে স্নান করে। আগের সুখস্মৃতি এখন স্বপ্নের মত মনে হয় তাদের। চারদিকে কামান বন্দুকের গর্জন, চারদিকে করাল কৃতান্তের বিভীষণ মুর্তি, চারদিকে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিভীষিকা, ওরই মধ্যে থেকে মহিলাদের চিন্তা, কবে এই দুর্বিসহ জীবনের শেষ হবে।

বিদ্রোহীদের পরাক্রমের সামনে ইংরেজ সৈন্য নিরুৎসাহ বোধ করে। যে সিপাহীদের আগে তারা তুচ্ছ করত এখন তাদেরই পরাক্রম দেখে তারা ভয় পায়। সিপাহীদের পাহারায়

অনেক টাকা, অনেক অস্ত্র ও অনেক লোকজন। ইংরেজের অস্ত্রাগার থেকে তারা যেসব কামান বন্দুক পেয়েছিল, তাছাড়া কানপুরের ঘাটে যেসব অস্ত্রসস্ত্র রাখা ছিল তাও তারা দখল করল। ইংরেজ গোলন্দাজ ও স্বেচ্ছা-সৈন্যরা যেসব কামান নিয়ে সজ্জিত ছিল, বিদ্রোহীদের কামানগুলো তার তুলনায় ঢের বড়।

এমনি করে সাত দিন কাটল।

সেনাপতি প্রতি মুহূর্তেই সাহায্যকারী সৈন্যদলের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

বিপদের ওপর আর এক বিপদ। আশ্রয়-দুর্গের দুটো বড় বড় ঘরের একটাতে খড়ের চালা ছিল। একদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ এই চালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। রাতে সেই আগুনের শিখা আকাশ পর্যন্ত উঠল। অনেক আহত ও পীড়িত ইংরেজ সেই ঘরে শুয়েছিল। তাদের নড়বার শক্তি ছিল না। তাই পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সাধ্যও তাদের ছিল না। শেষে জ্বলন্ত আগুনে তারা সবাই পুড়ে মরল। কাছে যারা ছিল, তারা ও তাদের বাঁচাবার কোন উপায় করতে পারল না।

বিদ্রোহীরা রাতের অন্ধকারে সেই আগুনের ওপর অনবরত গুলিবৃষ্টি করতে লাগল। দুজন ইংরেজ গোলন্দাজ সেই গুলির আঘাতে মারা গেল। পীড়িত ও আহতদের জন্যে খাদ্য ও ঔষধাদি যা কিছু সেখানে সঞ্চিত ছিল, আগুনে সেসব পুড়ে ছাই হয়ে গেল। হাসপাতালে যেসব জিনিস ও যন্ত্রপাতি ছিল, তাও সে-আগুনে নষ্ট হলো। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ও বিবিরা অনেক কষ্টে বের হয়ে খোলা জায়গায় আশ্রয় নিল। এইভাবে ক'দিন ক'রাত তারা নিরাশ্রয়ভাবে রইল আর তাদের ওপর বিদ্রোহীরা সমানে গুলি চালিয়ে গেল। বৃদ্ধ সেনাপতি হুইলার প্রমাদ গুণলেন।

কাছেই সবেদা কুঠি। প্রকাণ্ড বাড়ি।

নবাবগঞ্জের বাড়ি থেকে নানাসাহেব এখন সেইখানে উঠে এসেছেন। তাঁর সেনাপতি টিকাসিংহ এইখানেই শিবির স্থাপন করেছেন। তাঁতিয়া তোপি ও আজিমউল্লা এই কুঠিতে থেকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নানা পরামর্শ করছেন। এখান থেকেই হিন্দু-মুসলমান একযোগে ইংরেজদের উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। এই অগ্নিদাহের ঘটনার পরদিন নানা-সাহেব রামবক্সকে ডেকে পাঠালেন। সে একজন বিখ্যাত গোলন্দাজ। নানাসাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—রামবক্স, ওদিকের খবর কী ?

—খবর ভালো। আমরা চারদিক থেকে গোলাগুলি চালাচ্ছি, ইংরেজদের ব্যারাক জ্বলছে, তাদের খাবার জিনিস সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

—নামকরা কে কে মারা গেছে ?

—কালেক্টর হিলার্সডন, তার বিবি, হুইলারের ছেলে মেজর লিণ্ড, ছাপ্পান্ন নম্বর পলটনের কর্ণেল উইলিয়ম, এক নম্বর পলটনের কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট। কাপ্তেন হ্যলিডে যাচ্ছিল ব্যারাকে তার বিবির জন্য ঘোড়ার দুধ চাইতে, আমাদের গুলিতে সেও মারা যায়।

—বুঝলাম, বুড়ো হুইলার অনেকগুলো ভাল ভাল অফিসারকে হারিয়েছে। আর সব ইংরেজরা কি করছে ?

—তারা জেনারেল হুইলারের শিবিরে গিয়ে আর্তনাদ করছে আর বলছে, ‘আমরা এখন কোথায় যাব ?’

—হুইলার সাহেব কি করছেন ?

—তিনি বলছেন, ‘আমি কি করব, তোমরা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নাও।’

দিন যায়।

ইংরেজরা ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। আর বিদ্রোহীরা প্রবল হয়ে ওঠে।

বেড়ে ওঠে বিদ্রোহীদের আক্রমণের তীব্রতা। চোখের সামনে প্রিয়জন মরছে, তবুও শোক করবার অবসর নেই ইংরেজদের। যারা মরছে, তাদের ভাগ্য ভাল। অবরুদ্ধ ইংরেজরা এলাহাবাদের দিকে তাকিয়ে আছে, যদি সেখান থেকে কোন সাহায্য আসে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ।

এদিকে খাবার জিনিস কমে এল। বাইরে থেকে অনেক দেশী লোক তাদের খাদ্য দিতে চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারে নি। বিদ্রোহীদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। রাতে লুকিয়ে যদি কেউ চেষ্টা করেছে, উন্মত্ত সিপাহীদের কাছে তাদের নিষ্কৃতি ছিল না। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে একদিন পাঁচিলের পাশ দিয়ে একটা ধর্মের ষাঁড় যাচ্ছিল, ইংরেজরা সেইটাকে গুলি করে ভেতরে টেনে নিল। এমন কি, প্রাণের দায়ে বুড়ো ঘোড়া ও কুকুর পর্যন্ত তাদের খেতে হলো।

জলের কষ্ট ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। অবরোধের জায়গায় একটা মাত্র কূয়ো তারও জল অনেক নীচে। কেউ জল তুলতে গেলেই তাকে বাইরে থেকে দেখতে পাওয়া যেত। সে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারত না। পাঁচিলের কাছেই ছিল একটা প্রকাণ্ড পুরোনো কূয়ো। তিন সপ্তাহের মধ্যে দুশো পঞ্চাশ জন ইংরেজের মৃতদেহ সেই কূয়োর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো। অনেকের দেহ শেয়াল-কুকুরের পেটে গেল।

২৩শে জুন। সকাল বেলা। স্থান—সবেদা কুঠি।

নানাসাহেব, তাঁর সেনাপতি টিকাসিংহ, জোয়ালাপ্রসাদ, আজিমউল্লা ও তাঁতিয়া তোপি সবাই বসে আছেন। নানা-সাহেব তাঁদের সকলকে বললেন—আপনারা সকলেই জানেন আজ থেকে একশো বছর আগে বাংলা দেশে পলাশির মাঠে জালিয়াৎ ক্লাইভের কূট কৌশলে জয়লাভ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের মুল্লুক এদেশে কায়েম করে। বিশ্বাস-

ঘাতকদের বেইমানীর ফলে সেদিন নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটেছিল। পলাশি যুদ্ধের একশো বছর পরে এই সিপাহী-বিদ্রোহ। হিন্দুস্থানকে কোম্পানীর শাসন থেকে মুক্ত করবার এই সুযোগ। আমরা যেন হেলায় এ সুযোগ না হারাই। দিল্লী এখন আমাদের অধিকারে, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী, বেরিলি, বিহার—সব জায়গায় বিদ্রোহের আগুন ছাড়িয়ে পড়েছে। কানপুরে ইংরেজরা আজ তিন সপ্তাহ ধরে অবরুদ্ধ রয়েছে, হয়ত তারা আজকালের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করবে। আমি চাই প্রত্যেক মুসলমান সিপাহী যেন ফিরিঙ্গী বধ করবার জন্যে কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করে।

সেদিন বিদ্রোহীরা অনেক ইংরেজের প্রাণবধ করল।

ইংরেজদের শিবিরে সবাই ক্ষুধায় কাতর। ক্ষুধা যেন দাঁত বের করে ক্ষুধার্তদের চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করল। সুখের সময় যেসব খাবার জিনিস কেউ ছুঁতো না, এখন সেই সব জিনিস উপাদেয় মনে হতে লাগল। সব রকম জন্তুর পচা মাংস এখন ইংরেজদের কাছে সুস্বাদু ও সুখাদ্য।

ক্ষুধার সঙ্গে তৃষ্ণা। ক্ষুধার চেয়ে পিপাসা বেশী। কিন্তু জল কোথায়? যে কূয়ো থেকে ইংরেজরা সামান্য জল সংগ্রহ করত, সেই কূয়ো এখন বিদ্রোহীদের একমাত্র লক্ষ্য হলো। মোষক কাঁধে করে জল আনতে গেলেই তার নিশ্চিত মৃত্যু। বিদ্রোহীরা সেই কূয়োর চারদিকে পাহারা রেখেছিল। জলের অভাবে ইংরেজ শিবিরে হাহাকার উঠল।

সবেদা কুঠিতে বসে নানাসাহেব এইসব বিবরণ শোনেন আর তাঁর মনে আশা হয়—অভীষ্টসিদ্ধির দিন বুঝি এগিয়ে এল।

॥ এগার ॥

অবরোধের পর তিন সপ্তাহ কেটে গেল।

ইংরেজ শিবিরে নৈরাশ্যের ছায়া নেমে এসেছে।

এই একশো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে ইংরেজদের ভাগ্যে এমন বিপদ আর ঘটেনি, শিবিরে বসে বিষন্ন মনে ভাবেন বৃদ্ধ জেনারেল হুইলার। চোখের সামনে তাঁর ছেলে মরেছে, মরেছে অসংখ্য ইংরেজ নরনারী, এক ফোঁটা জলের অভাবে মরেছে কত শিশু। সাহায্যের জন্যে একদল সৈন্যও তো এল না! আশা করেছিলেন, সাহায্য আসবে, কিন্তু সে আশা মনের ভুল মাত্র। এতে শুধু কি সুদক্ষ অফিসারেরাই মরেছে, কামানগুলোও অকেজো হয়ে এসেছে। বারুদ ও অন্যান্য অস্ত্রাদি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। দুর্ভিক্ষ যেন করাল মূর্ত্তি ধারণ করে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে। এ অবস্থায় আর বেশীদিন থাকা যায় না।

সেদিন ২৪শে জুন, বুধবার। সকালবেলাই নানাসাহেব আজিমউল্লাকে ডেকে পাঠালেন। আজিমউল্লা আসতেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—আজিম, তোমার চিঠি তৈরি?

আজিমউল্লা বললেন—হ্যাঁ, তৈরি। এই বলে তিনি নানা-সাহেবের হাতে একখানা চিঠি দিলেন।

নানাসাহেব চিঠিখানা পড়ে বললেন—ঠিক হয়েছে। তারপর তাতে সই করে শীল মোহর লাগিয়ে তিনি বললেন—আজিম, মিসেস জ্যাকোবি কোথায়?

—আমাদের এখানেই।

—তাকে একবার ডেকে আনো আমার কাছে।

কিছুক্ষণ পরেই আজিমউল্লা মিসেস জ্যাকোবিকে নিয়ে ফিরে এলেন। সবেদা কুঠিতে বন্দিনী এই ইংরেজ মহিলা

ছদ্মবেশে যখন লক্ষ্ণৌ পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে, তখনই নানাসাহেবের সিপাহীদের হাতে ধরা পড়ে। সেই থেকে তাকে এইখানেই নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে।

মিসেস জ্যাকোবি আসতেই নানাসাহেব তাকে বললেন—জ্যাকোবি, তোমাকে একবার হুইলারের কাছে যেতে হবে, আমার একখানা জরুরী চিঠি নিয়ে।

—কখন যাব ?

—এখুনি। এই নাও চিঠি। এই বলে নানাসাহেব মিসেস জ্যাকোবির হাতে একখানা চিঠি দিলেন। তারপর বললেন—বাইরে পাল্কী তৈরি আছে। সেই পাল্কী করে যাবে আর হুইলারের উত্তর নিয়ে চলে আসবে।

নানাসাহেবের চিঠি নিয়ে মিসেস জ্যাকোবি এল ইংরেজ শবিরে। প্রহরীরা প্রবেশ পথেই তার পাল্কী আটকাল। পরে যখন তারা দেখল যে পাল্কীর আরোহিণী একজন ইংরেজ মহিলা, শত্রুর কোন গুপ্তচর নয়, তখন তাদের সন্দেহ দূর হলো। জ্যাকোবি ভেতরে এসে জেনারেল হুইলারের হাতে চিঠিখানা দিলেন। ছোট্ট একটুকরো কাগজে লেখা। আজিম-উল্লার হস্তাক্ষর, আর তাতে স্বাক্ষর নানাসাহেবের। চিঠির অর্থ পরিষ্কার—আত্মসমর্পণ !

অবশেষে এত কষ্ট সহ্য করে আত্মসমর্পণ !

ইংরেজ-শিবিরে তখন যেসব সৈনিকপুরুষ ছিল, আত্ম-সমর্পণের কথায় সকলেই কেঁপে উঠল। একজনও এতে মত দিল না।

কাপ্তেন মুর জিজ্ঞাসা করলেন—কি লেখা আছে চিঠিতে ?

হুইলার পড়ে শোনালেন—লর্ড ডালহৌসির কাজের সঙ্গে যাদের কোন রকম সম্বন্ধ নেই এবং যারা অস্ত্র পরিত্যাগ করতে রাজী আছে, তারা নিরাপদে এলাহাবাদে যেতে পারবে।

কাপ্তেন হুইটিং বললেন—বিঠুরের মহারাজাকে এখন আর

বিশ্বাস করা যায় না। তাঁকে তো আমরা চিরকাল আমাদের বন্ধু বলেই জানতাম। এলাহাবাদ বা লক্ষ্ণৌ থেকে আমাদের সাহায্য একদিন আসবেই। আমরা বরং মরব তবু আত্মসমর্পণ করব না।

—ঠিক বলেছ বন্ধু। ইংরেজ যুদ্ধে মরে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করে না, বললেন হুইলার।

—কিন্তু এখানে শুধু আমরাই নেই, বহু শিশু ও মহিলা আছে। তাদের কথাটা একবার ভেবে দেখতে হবে, বললেন কাপ্তেন মুর।

—সেই তো প্রধান সমস্যা, বললেন হুইলার।

সুতরাং নানাসাহেবের প্রস্তাব তখন অগ্রাহ্য করা হলো না।

পত্র-বাহিকাকে এই বলে বিদায় করা হলো—তুমি গিয়ে নানাসাহেবকে বলো,তাঁর প্রস্তাব আমরা বিবেচনা করে দেখ্‌ছি।

মিসেস জ্যাকোবি সেনাপতির উত্তর নিয়ে ফিরে এল।

সিপাহীদের আক্রমণ স্থগিত রইল।

সেই দিনই সন্ধ্যেবেলায় ইংরেজ-শিবির থেকে এক দূত এসে সংবাদ দিল জেনারেল হুইলার নানাসাহেবের প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন।

পরের দিন সকাল বেলা।

নানাসাহেবের প্রতিনিধি হিসেবে ইংরেজ-শিবিরে এলেন আজিমউল্লা ও জেনারেল জোয়ালাপ্রসাদ। তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন কাপ্তেন মুর ও কাপ্তেন হুইটিং। উভয় পক্ষের আলোচনায় স্থির হলো যে, ইংরেজরা তাদের কামান ও টাকাকড়ি সব পরিত্যাগ করে যাবেন, তবে তাঁদের নিজের নিজের বন্দুক ও ষাটবার গুলি ছোঁড়া যায় এই পরিমাণ টোটা সঙ্গে রাখতে পারবেন। নানাসাহেব তাঁদের দস্তুরমত পাহারায় গঙ্গাতীর পর্যন্ত নিরাপদে যেতে দেবেন। সেখানে তাঁদের জন্যে নৌকো

প্রস্তুত থাকবে এবং তাঁদিগকে কিছু খাদ্যদ্রব্যও দেওয়া হবে। তার পরদিন তাঁরা এলাহাবাদে যাবেন।

এই ভাবেই লেখা হলো সন্ধিপত্র।

হুইলারের প্রতিনিধি হিসেবে তাতে স্বাক্ষর করলেন মুর ও হুইটিং। তারপর সেই সই-করা কাগজ নিয়ে আজিমউল্লা ফিরে এলেন সবেদাকুঠিতে। নানাসাহেবের হাতে দিলেন ইংরেজদের আত্মসমর্পণের চিঠি। আবার বেলা দুপুরের পর সবেদাকুঠি থেকে একজন ঘোড়সওয়ার এল ইংরেজ শিবিরে সন্ধির কাগজ নিয়ে। তাতে লেখা ছিল—ইংরেজদের সর্তে নানাসাহেব রাজী হয়েছেন; ইংরেজরা যেন সেই রাতেই শিবির খালি করে দেয়।

বৃদ্ধ সেনাপতি এই প্রস্তাবে রাজী হলেন না। লিখে পাঠালেন—কাল সকালের আগে শিবির ছেড়ে যাওয়া হতে পারে না।

নানাসাহেব সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হলেন। তাঁর শিক্ষক মিঃ টডের মারফৎ নানাসাহেব তখন হুইলারকে এই কথা জানিয়ে দিলেন। সেই রাত্রেই ইংরেজরা তাদের কামানগুলো বিদ্রোহীদের হাতে সমর্পণ করল।

২৭শে জুন, সকালবেলা।

ভোর হতেই ইংরেজরা বেরিয়ে পড়ে তাদের মাটির দুর্গ থেকে। তাদের কোমরে পিস্তল, কাঁধে বন্দুক। সংখ্যায় তারা চারশো পঞ্চাশ জন। বিবর্ণ তাদের মুখ, ছিন্ন তাদের পরিধেয় বস্ত্র। গঙ্গার ধারে যেখানে তাদের জমা হবার কথা, শিবির থেকে সে জায়গাটা এক মাইল দূর। এইটুকু পথ, তবু তাদের কাছে মনে হলো যেন কতদূর আর কত কষ্টকর। যারা আহত ও রুগ্ন তাদের জন্যে পাল্কীর ব্যবস্থা হয়েছে, মেমসাহেব ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে গরুর গাড়ি ও হাতি। বাকী সবাই চললো পায়ে হেঁটে। সকলের আগে কাপ্তেন মুর, সকলের

পেছনে আর একজন কাপ্তেন, নাম ভাইবার্ট। এ-যে তাদের জীবনের শেষে সমাধিযাত্রার মিছিল, তা সেই অসহায় ইংরেজদের কেউই কল্পনা করতে পারল না। বৃদ্ধ হুইলার তাঁর রুগ্ন স্ত্রী ও মেয়েদের নিয়ে চললেন পাল্কীতে।

ক্রমে সেই বন্দী-জনতা গঙ্গার তীরে এসে উপস্থিত হলো।

গঙ্গার তীরে সতীচৌর ঘাটে নৌকো তৈরি ছিল। এই সব নৌকো করেই তারা এলাহাবাদ যাবে। ঘাটের কাছেই একটা গ্রাম ছিল। গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। গ্রামটির নামও সতীচৌর। এই নাম থেকেই ঘাটের এই রকম নাম রাখা হয়েছে। গরমের দিন, গঙ্গার জল কম, এখানে-ওখানে চর জেগেছে। নৌকোগুলো একেবারে তীরে আসতে পারে নি, কাজেই ইংরেজরা হাঁটু-জল ভেঙে নৌকোয় উঠতে লাগল।

বেঁচে থাকলে সুখের মুখ দেখতে পাব, এই আশায় কারো কারো মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। ঘরের দামী জিনিস ফেলে আসতে হয়েছে, সেই দুঃখেও অনেকে ম্রিয়মান। অনেকে আবার আত্মীয় বন্ধু বিয়োগের শোকে ও অভিভূত—কারো ছেলে মারা গিয়েছে, কারো ভাই, কারো বোন, আবার কোন কোন স্ত্রীলোক স্বামী ও পুত্র দুই-ই হারিয়েছে—এক একজন এক এক রকমের দুঃখে কাতর। এখন এলাহাবাদ থেকে কলকাতা, তারপর সেখান থেকে ইংলণ্ড—সমুদ্রপারে দূর স্বদেশের ছবিও অনেকের চোখে ভেসে ওঠে।

ঘাটের কাছে কাঠের তৈরি একটা সেতু। তাতে শাদা রঙ দেওয়া। নৌকোয় উঠবার জন্যে যারা সেতুর কাছে জমা হয়েছিল, তাদের দুর্দশার একশেষ। কর্ণেল ইওয়ার্ট আহত ছিলেন। তাঁকে একখানা ডুলি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাঁর পাশে পাশে চলেছেন তাঁর মেমসাহেব। বেহারারা আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, তাঁরা তাই দলের অনেক পিছনে পড়েছিলেন। ডুলিখানা সেতুর কাছে আসতেই ক'জন সিপাহী বেহারাদের

বললে—নামা ডুলি। বেহারারা ভয়ে ভয়ে তাদের কথা শুনে ডুলি নামায়। মুমূর্ষু কর্ণেলকে সিপাহীরা উপহাস করে, তারপর তারা এক সঙ্গে তাঁর ওপর তলোয়ার চালায়। তাঁর বিবিকেও তারা তখুনি কেটে ফেললো।

বৃদ্ধ হুইলার পাল্কী করে যাচ্ছিলেন। ঘাটে আসতেই তিনি বলেন—নৌকোর কাছে পাল্কী নিয়ে যাও।

কাছেই দাঁড়িয়েছিল ক'জন বিদ্রোহী সওয়ার। তাদেরই একজন বললে—না তা হবে না, এইখানেই নামতে হবে। অগত্যা হুইলার সেইখানেই নামলেন। আর একজন সওয়ার সেই সময় তাঁর গলা লক্ষ্য করে তলোয়ারের কোপ মারে। অমনি সেনাপতির মৃতদেহ জলে পড়ে যায়।

গঙ্গার কিনারায় সারি সারি নৌকো সাজান। আট দাঁড় বজ্‌রা। প্রত্যেক বজরার মাথায় খড়ের চাল; দূর থেকে দেখলে মনে হবে খড়ের গাদা। জল অনেক নীচে। তীর থেকে নৌকোর ধার পর্যন্ত কাদা ভেঙে যেতে হয়। ছেলে-কোলে মেমসাহেবেরা এবং ইংরেজ পুরুষেরা দলে দলে হাঁটু পর্যন্ত কাদা মেখে নৌকোয় উঠবার জন্যে ভিড় করতে লাগল। বেলা ন'টার সময় সকলের নৌকোয় ওঠা শেষ হলো। তখন তারা ভাবল দয়াময় ঈশ্বর এ-যাত্রা রক্ষা করলেন।

কিন্তু নৌকো ছাড়ে কই? পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনর মিনিট, আধ ঘণ্টা হয়ে গেল নৌকো ছাড়ে না! অধৈর্যের সঙ্গে তারা প্রতীক্ষা করে। বোধ হয় মাঝিরা হুকুমের অপেক্ষায় আছে। তখনো পর্যন্ত কেউ কেউ তীরেই দাঁড়িয়েছিল, তাদের মনে, আর যারা নৌকোয় উঠেছিল, তাদের মনেও নানা রকমের আতঙ্ক—অন্য রকমের আশঙ্কা। অনেকের মনে হলো —যে সব নৌকো সাজান হয়েছে তা হয়তো তাদের বধ্যস্থান। এই হয়তো শত্রুদের গুপ্ত অভিসন্ধি।

নৌকোয় ওঠা শেষ হলো। তাঁতিয়া তোপি, আজিমউল্লা

ও সেনাপতি টিকাসিংহ তীরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের সঙ্গে ছিল ঘোড়সওয়ার ও গোলন্দাজ সৈন্য আর কয়েকটা কামান। এগুলো ইংরেজরা দেখতে পায় নি। হঠাৎ ভেরী বেজে উঠল আর সঙ্গে সঙ্গে মাঝিরা নৌকো থেকে জলে লাফিয়ে পড়ল। দুই তীর থেকে নৌকোর ওপর গোলাবৃষ্টি হতে লাগল। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়তে লাগল নৌকোয়। শেষে ছইগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল।

গঙ্গার জল লালে লাল হয়ে গেল। গোলাগুলির শব্দ আর আরোহীদের আর্তনাদ মিশে একটা ভীষণ অবস্থার সৃষ্টি করল। তাঁতিয়া তোপির হুকুমে সওয়ারেরা জলে নেমেছিল। কতক লোক নৌকোর মধ্যেই পুড়ে মরল, কতক ছেলেমেয়ে নিয়ে গঙ্গাজলে ঝাঁপ দিল। বিদ্রোহীরা গঙ্গার মধ্যেই তাদের গুলি করে মারল। যারা বেঁচে উঠল, বিদ্রোহী সওয়ারেরা সঙ্গীনের খোঁচায় তাদের উদ্যম ভেঙে দিল। তারা আর কিনারায় উঠতে পারল না।

সবেদাকুঠিতে বসে নানাসাহেব সব খবরই পেলেন।

তিনিই এই মহাযজ্ঞের হোতা!

সবেদাকুঠিতে বসে নানাসাহেব এই হত্যাকাণ্ডের কথাও সব শুনলেন।

কিছুক্ষণ পরেই সেনাপতি জোয়ালাপ্রসাদ এলেন। নানা-সাহেব বললেন—পুরুষদের মধ্যে যেন কেউ বেঁচে না থাকে।

—গঙ্গার হত্যাকাণ্ড শেষ! কিছু স্ত্রীলোক, শিশু আর জনকতক আহত ইংরেজ বেঁচে আছে।

—তাদের কি করা হয়েছে?

—তাদের আমরা বন্দী করেছি।

—সংখ্যায় তারা কত?

—একশো পঁচিশ। যে-পথ দিয়ে তারা নৌকোয় উঠতে গিয়েছিল, সে-পথ দিয়েই তাদের নিয়ে আসা হয়েছে।

—মেমসাহেবদের আর শিশুদের এখানে পাঠিয়ে দাও। বাকী সকলের প্রাণদণ্ডের হুকুম দিলাম। কানপুরে যেন একটা ফিরিঙ্গীও বেঁচে না থাকে। কোনো নৌকো রক্ষা পায়নি তো?

—হ্যাঁ, একখানা নৌকো ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে।

—সৈন্য পাঠাও, কামান পাঠাও, গঙ্গার তীরে তীরে নজর রাখো, যেমন করেই হোক সে নৌকো ধরতে হবে।

পুরুষদের প্রাণদণ্ড হলো। মেমসাহেব ও তাদের ছেলে-মেয়েদের সবেদাকুঠিতে অবরুদ্ধ করে রাখা হলো।

বলিদান শেষ হলো।

নানাসাহেব বিঠুর প্রাসাদে ফিরলেন পূর্ণ মনোরথ হয়ে।

পয়লা জুলাই নানাসাহেব মহাসমারোহে 'পেশবা' বলে ঘোষিত হলেন। সমস্ত কানপুর সন্ধ্যা থেকে আলোকমালায় ঝলমল করতে লাগল। নতুন পেশবার রাজ্যাভিষেক ঘোষণা করে তোপধ্বনি হলো। মহাসম্মানে নানাসাহেব সিংহাসনে উঠলেন। ললাটে ধারণ করলেন রাজটীকা। উৎসবের আলোকমালায় অন্ধকার দূরে গেল। হাজার হাজার আতস-বাজি চারদিক আলোকিত করে আকাশের নক্ষত্র পথে উঠল।

এই উৎসবে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগ দিয়েছিল।

ঝাঁসি থেকে রাণী লক্ষ্মীবাঈ অভিনন্দন পাঠালেন বিঠুরের নতুন পেশবাকে।

রাজধানী কলকাতায় বসে বড়লাট লর্ড ক্যানিং শুনলেন এই সংবাদ। সংবাদ নয়—দারুণ দুঃসংবাদ। তিনি তখন আর একবার চাইলেন ভারতের আকাশের দিকে—মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে সেই আকাশ। কোম্পানীর রাজত্ব বুঝি যায়! দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ—সর্বত্রই উড়ছে বিদ্রোহীদের জয়পতাকা।

॥ বারো ॥

একখানা নৌকো বেঁচে গিয়েছিল। দৈবক্রমে সেটাতে আগুন লাগেনি। সেটাতে ছিলেন কাপ্তেন মুর, মেজর বোইবার্ট, কাপ্তেন হুইটিং প্রভৃতি কয়েকজন অফিসার ও জনচারেক ইংরেজ সৈন্য। ইতিমধ্যেই নানাসাহেব বিদ্রোহীদের আদেশ দিয়েছেন নৌকো ধরবার জন্য। যখন ঐ ইংরেজ সৈন্যরা জলে নেমে কাঁধ দিয়ে বজরা ঠেলে গভীর জলে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় বিদ্রোহীদের গুলিতে কাপ্তেন মুরের বুক বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং আরো ত্বজন সৈন্য নিহত হলো। যারা মরল আর যারা আহত হয়ে মরার মতো হলো, তারা বজরার তলায় জড়াজড়ি করে পড়ে ছিল। যারা বাঁচল, তাদের এককণাও খাদ্যদ্রব্য ছিল না।

সারারাত ধরে বিদ্রোহীরা গোলাগুলি চালিয়েছে। হাল বা দাঁড় কিছুই ছিল না বলে স্রোতে নৌকো ভেসে চলল। খাবার জিনিসের অভাবে আরোহীরা শুধু গঙ্গার জল পান করে জীবন ধারণ করল। ওদিকে কানপুর থেকে একখানা নৌকো সেই বজরার পিছু নিয়েছে। সেই নৌকোয় পঞ্চাশ ষাট জন অস্ত্রধারী সিপাহী ছিল। তাদের ওপর বজরায় উঠে জীবিত ইংরেজদের মেরে ফেলার হুকুম ছিল। কিন্তু তাদের নৌকোখানা চড়ায় লেগে অচল হয়ে যায়। তখন ইংরেজরা সেই নৌকোখানা আক্রমণ করে তার ওপর অনবরত গুলি চালাতে থাকে। বিদ্রোহীদের অনেকেই মারা পড়ল, যারা বাঁচল তারা নৌকো ফেলে পালিয়ে গেল।

ইংরেজরা সেই নৌকোয় উঠল, কেন না দুই তীর থেকে গোলা বর্ষণের ফলে তাদের বজরার চালে আগুন ধরে গিয়েছিল। বিদ্রোহীদের পরিত্যক্ত নৌকোয় কিছু খাবার জিনিস ও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেল। কিন্তু সে খাবার আর

ক'দিন ? খাবার ফুরিয়ে গেল। শুরু হলো উপোস। সেই অবস্থায় একদিন তারা ঘুমিয়ে পড়ল। যখন জাগল, তখন দেখল প্রবল-বায়ু বইছে, নৌকোখানা ঘুরে ঘুরে জোরে ভেসে চলেছে।

তখন রাত্রিকাল। ঘোর অন্ধকার রাত। নৌকো কোন্ দিক দিয়ে যাচ্ছে, ইংরেজরা তা বুঝতে পারল না। জেগে জেগে তারা স্বপ্ন দেখছে—তাদের বাঁচাবার জন্যে যেন সাহায্যকারী লোক আসছে! রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্বপ্ন আবার মিলিয়ে যায়। সামনে দেখা দিল ভীষণ নৈরাশ্যের মূর্তি! নৌকোখানা গঙ্গার স্রোত থেকে একটা ছোট্ট নালার মধ্যে এসে পড়েছে। বিদ্রোহীরা দূর থেকে তা দেখতে পেয়েছিল। কাছাকাছি এসে তারা সেইখানে গুলি বৃষ্টি করতে লাগল।

মেজর ভাইবার্টের দু'খানা হাতই জখম, তার ওপর আবার তাঁর গায়ে গুলি লাগল। মরবার সময়েও তিনি তার সঙ্গীদের বলে গেলেন—তোমরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করো। দ্বিতীয় দিন রাতে যখন তারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর, তখন নৌকো এসে তীরে লাগল। কাপ্তেন টমসন বারো জন সৈন্য নিয়ে তীরে লাফিয়ে পড়লেন। এ-দিকে নৌকো আবার স্রোতে ভেসে চলে গেল।

এখানেও বহু সশস্ত্র লোক ইংরেজদের আক্রমণ করল। তারা উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে দৌড়তে তিন মাইল দূরে গিয়ে একটা মন্দির দেখতে পেল। সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে এবং মন্দিরের শীতল জল পান করে একটু সুস্থ হলো। তখন চারজন সৈন্য বন্দুক ও সঙ্গীন নিয়ে মন্দিরের দরজা রক্ষা করতে লাগল। আর অন্য সিপাহীরা শুকনো কাঠ জড়ো করে মন্দিরের সামনে আগুন ধরিয়ে দিল।

মন্দিরে জানালা ছিল না; মন্দিরটা ছিল খুব ছোট, বারোজনের থাকা কষ্টকর; তারপর প্রচণ্ড উত্তপ্ত ধোঁয়া,

কাজেই অবরুদ্ধ ইংরেজরা হঠাৎ বের হয়ে নদীতীরের দিকে ছুটতে লাগল। তীরে পৌঁছবার আগেই পাঁচজন এবং তীরে পৌঁছে আরো তিনজন বিপক্ষের গুলিতে প্রাণ দিল। বাকী কয়জন বন্দুক ফেলে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবসন্ন দেহে ভাসতে ভাসতে তারা একটা জায়গায় এসে পৌঁছল। জায়গাটার নাম মেরারসেট। সেখানকার রাজা দিগ্বিজয় সিংহ কোম্পানীর খুব অনুরক্ত ছিলেন। তিনি তাদের আশ্রয় দিলেন।

নানাসাহেব কানপুরে এলেন। নতুন পেশবার নতুন রাজধানী এখন কানপুর। রাজধানীতে পেশবার স্বাক্ষরিত নতুন ঘোষণাপত্র প্রচারিত হলো।

সেনাপতি হ্যাভলক সসৈন্যে কানপুরে আসছেন জেনে নানাসাহেব তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। জয়লাভের সমস্ত উপকরণই তাঁর নিজের হাতে। আত্মবিশ্বাসে তিনি অটল রইলেন। মারাঠার প্রভুত্ব নতুন করে স্থাপিত হয়েছে, এবার কানপুরের গঙ্গাতীরে আবার একটা নতুন জয়লাভ করতে হবে—এই আত্মপ্রসাদে অধীর হয়ে উঠলেন তিনি।

ইতিমধ্যে ইংরেজ বন্দীদের সবেদা কুঠি থেকে সরিয়ে এনে আর একটা ছোট বাড়িতে রাখা হয়েছিল। বাড়িটার নাম বিবিঘর। বন্দীদের সংখ্যা প্রায় দুশোর কাছাকাছি। ভেড়ার খোঁয়াড়ে কশাইরা যেমন মেষপালকে বেঁধে রাখে, ইংরেজের বিবি ও শিশুদের অবস্থাও এখানে সেই রকম হলো। এই সময়ে ফতেগড় থেকে কতকগুলো ইংরেজ প্রাণ বাঁচাবার জন্য কানপুরের দিকে আসছিল। নবাবগঞ্জের কাছে তারা ধরা পড়ে।

তারপর তাদেরও কানপুরে আনা হলো। পুরুষদের কেউই নিষ্কৃতি পেল না। মেমসাহেব ও বালক-বালিকাদের বিবিঘরে

আটক করে রাখা হলো। একদিকে গঙ্গা, অন্যদিকে শহরের হিন্দুস্থানী পল্লী তারই মাঝখানে বিবিঘর। নানাসাহেবের নতুন বাসস্থান থেকে জায়গাটা খুব দূরে ছিল না। রাতে বিঠুর রাজের আমোদ উৎসবে তাঁর বাসস্থান উজ্জ্বল আলোকমালায় বিভূষিত হয়, দ্বারে দ্বারে মশাল জ্বলে, আর বিবিঘর থেকে বিবিরা সেই উজ্জ্বল দৃশ্য দেখে।

বিবিঘরের হতভাগ্য বিবিরা শিশুদের সঙ্গে দলবদ্ধ হয়ে সেখানকার ছোট ছোট ঘরের মধ্যে পড়ে ছিল। বাজারে যেসব সামান্য খাবার পাওয়া যায়, তাই তাদের দেওয়া হতো। সে খাবার মুখে তুলতে তাদের কষ্ট হতো, তবু প্রাণের দায়ে খেতে হতো। অসহ্য যন্ত্রণা ! তার ওপরে কলেরা ও পেটের অসুখ। তাতেই ক'জন মারা গেল। একজন মেমসাহেব রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করল। শেষে মেমসাহেবদের গম-পেষার কাজ দেওয়া হলো। নানাসাহেবের বাড়ির উঠানেই তারা যাঁতা ঘুরাত। বিবিঘরে তাদের ছেলেমেয়েরা উপোসে মরছে, তাই ময়দা পেষা শেষ হলে, বিবিরা তাদের জন্যে কিছু আটা নিয়ে কারাগৃহে ফিরত।

৭ই জুলাই বিকেল বেলায় জেনারেল হ্যাভলক সসৈন্যে কানপুর যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে গেল এক হাজার ইংরেজ পদাতিক, একশো ত্রিশ জন শিখ সৈন্য, দুটো কামান, আর কিছু ঘোড়সওয়ার। ক'জন দক্ষ অফিসারও তাঁর সঙ্গে রইলেন। ওদিকে এলাহবাদ থেকে সেনাপতি নীলের আদেশে আর একদল সৈন্য নিয়ে কাপ্তেন রেমণ্ড আসছিলেন কানপুরের দিকে। রাস্তায় দুই দলে দেখা হলো। তখন দুই দলের মোট সৈন্যবল দাঁড়াল দেড় হাজার ইংরেজ সৈন্য, ছ'শো দেশীয় সৈন্য আর আটটা কামান।

১২ই জুলাই সকালে দুই সেনাদল একসঙ্গে যাত্রা করে ঝিলীন্দে এসে তাঁবু ফেলল। সেখান থেকে ফতেপুর চার মাইল

দূর। কিন্তু পদাতিক সৈন্যরা ক্লান্ত, তাদের পায়ের তলা ক্ষত বিক্ষত। সেইজন্য জেনারেল হ্যাবলক তাদের বিশ্রাম করবার অবকাশ দিলেন। অস্ত্রশস্ত্র এক স্থানে স্তূপীকৃত, সৈন্যরা যাবার জন্যে প্রস্তুত, হঠাৎ একটা চব্বিশ পাউণ্ডের গোলা সেনাপতি হ্যাভলকের পায়ের তলায় এসে পড়ল। সৈন্যদের ক্ষুধাতৃষ্ণা উড়ে গেল।

ব্যাপার কী! কার গোলা? কোথা থেকে এলো? একজন কর্ণেল বেরুলেন খোঁজ নিতে। পথেই একজন ইংরেজ চরের সঙ্গে দেখা। চরের মুখে তিনি খবর পেলেন বিদ্রোহীরা ফতেপুরে এসে জমা হয়েছে। সৈন্যদের আর যাওয়া হলো না। যাবার কথা তাদের মনেও থাকল না; অদূরে শত্রু, এখনি যুদ্ধ বাধবে। হ্যাভলক আদেশ দিলেন—ফতেপুর চলো।

এ-দিকে ইংরেজ সৈন্যকে বাধা দেবার জন্যে চলেছেন সেনাপতি জোয়ালাপ্রসাদ ও টিকাসিংহ।

তাঁদের সঙ্গে দেড় হাজার পদাতিক ও গোলন্দাজ, পাঁচশো অশ্বারোহী, দেড়হাজার সশস্ত্র সাধারণ লোক আর বারোটা কামান। হ্যাভলকের সৈন্যদের আগেই নানাসাহেবের এই বাহিনী ফতেপুরে শিবির স্থাপন করেছিল। এই শিবির থেকেই ইংরেজ-শিবিরে ঐ গোলা পড়েছিল। শীঘ্রই দুইদলে সাক্ষাৎ হলো। হ্যাভলকের সৈন্য জোয়ালাপ্রসাদের সৈন্যের মুখোমুখি দাঁড়াল। বিদ্রোহীরা জীবনমরণ তুচ্ছ করে যুদ্ধ করল। জোয়ালা প্রসাদের অশ্বারোহীদল অসাধারণ বীরত্ব ও রণনৈপুণ্য দেখাল। ইংরেজের কামান ও বন্দুকের পাল্লা বেশী ছিল বলে, সেনাপতি হ্যাভলকই শেষে এই ফতেপুরের যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। এখানে নানাসাহেবের দল বিষম আঘাত পেল।

সম্পূর্ণ পরাজয়! বিদ্রোহীরা কামান ফেলে পালিয়ে গেল। ইংরেজের এই জয়ের আগে ফতেপুর পাঁচ সপ্তাহ ধরে নানাসাহেবের অধীনতা স্বীকার করেছিল। এখানে উত্তেজিত

সিপাহীরা কয়েদীদের মুক্ত করে, ধনাগার লুঠ করে ও কাছারীঘর জ্বালিয়ে দেয়। এখানকার দশ জন ইংরেজের মধ্যে নয় জন পালিয়ে যায়, কেবল একজন ইংরেজ বিচারপতি কিছুতেই স্থান ত্যাগ করেন নি। সিপাহীরা তাঁকে মেরে ফেলেছিল।

এইবার ইংরেজ ও শিখ সৈন্য তার প্রতিশোধ নিল। তারা লুঠ করল, ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিল, তোপ দিয়ে বড় বড় বাড়ি উড়িয়ে দিল।

এই সময়ে বালারাও সসৈন্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অভিযান করে আওঙ্গ নামক এক গ্রামে শিবির স্থাপন করেছিলেন। এখানে তাঁর সৈন্যদের সঙ্গে হ্যাভলকের সৈন্যদলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। নানাসাহেবের সৈন্য, বিশেষ করে অশ্বারোহীদল, এবারেও রণনৈপুণ্য ও পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা দেখাল। কিন্তু ইংরেজের এনফিল্ড রাইফেল আর দূর পাল্লা কামানের মুখে তারা কিছুই করতে পারল না। তবুও বালারাও-এর সৈন্যরা অপূর্ব কৌশলে বিপক্ষকে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করল,কিন্তু দু'ঘণ্টা নিদারুণ যুদ্ধের পর তারাও হেরে গেল। এই যুদ্ধে সেনাপতি রেণ্ড নিহত হলেন আর বালারাও আহত হয়ে কানপুরে ফিরলেন।

কানপুরে বসেই নানাসাহেব ফতেপুর ও আওঙ্গ-এর খবর শুনলেন। তখন কানপুরেই হ্যাভলকের সৈন্যদলকে বাধা দেওয়া হবে ঠিক হলো। জেনারেল হ্যাভলককে প্রবেশ পথেই বাধা দেবার জন্য নানাসাহেব তাঁর ভাই বাবাভট্টকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে বললেন—কোন রকমে যদি পাণ্ডুনদীর সেতুটা উড়িয়ে দিতে পার, তাহলে খুব ভাল হয়। আমরা ভাল করে প্রস্তুত হবার সময় পাই। বাবাভট্ট পেশবার আদেশ পালনে তৎপর হলেন।

ও-দিকে জেনারেল হ্যাভলক আর দেরী না করে কানপুর যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলেন। আওঙ্গ গ্রামের বাইরে

পাণ্ডুনদী। সেই নদী পার হয়ে কানপুরে আসতে হয়। ছোট নদী, কিন্তু বর্ষার জলে এখন তা পরিপূর্ণ,স্রোতের বেগও প্রবল। পারাপারের এই একটি মাত্র সেতু ছিল। বিপক্ষেরা দল যদি সেই সেতু ভেঙে দিয়ে থাকে, তাহলে হ্যাভলকের সৈন্যদের পার হয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু যখন গুপ্তচর এসে খবর দিল, সেতু এখনো ভাঙেনি, তবে বিদ্রোহীরা ভাঙবার মতলবে ধারে ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হ্যাভলকের তখন একটু ভরসা হলো। তিনি সৈন্যদের সেতুরক্ষার আদেশ দিলেন। হ্যাভলকের শিবির থেকে পাণ্ডুনদী দু'মাইল দূর। সে-রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত হলো। পরের দিন সকালেই ইংরেজ সৈন্য নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু বিপক্ষের দল আরো বেড়ে উঠেছিল।

নানাসাহেবের ভাই বাবাভট্ট কানপুর থেকে অনেক সিপাহীর সঙ্গে বড় বড় কামান নিয়ে নদীর অপর পারে তাঁবু ফেলে-ছিলেন। কামান থেকে গোলা বর্ষণ করে সেতুটা উড়িয়ে দেবেন, এই রকম ছিল তাঁর মতলব।

হ্যাভলকের সৈন্যদের কম্যাণ্ডার ছিলেন কাপ্তেন কড্। হঠাৎ তাঁর কামান থেকে ঘন ঘন গোলা এসে পড়তে লাগল অপর পারে। তখন বাবাভট্টের সৈন্যরা হতাশায় তাঁবু গুটিয়ে পালিয়ে গেল। তারপর হ্যাভলকের সৈন্যবাহিনী নির্বিঘ্নে নদী পার হয়ে চললো কানপুরের দিকে।

ও-দিকে কানপুরে তখন আর একটা ভয়ঙ্কর সংহারকাণ্ডের আয়োজন হচ্ছিল।

১৫ই জুলাই বিকেলে নানাসাহেব খবর পেলেন, জেনারেল হ্যাভলক বহু সৈন্য নিয়ে তাঁর রাজধানী আক্রমণ করতে আসছেন। ক্ষতবিক্ষত বাবাভট্ট যখন কানপুরে পৌঁছলেন, তখন তাঁর মুখে সব শুনে নানাসাহেব হ্যাভলকের পরাক্রম বুঝে নিলেন। তিনি আরো বুঝলেন, এবার হয়ত তাঁর অল্প দিনের এই পেশবা শাহী উপাধি ফুরিয়ে যাবে।

এখন কি করা যায়?—ভাবলেন নানাসাহেব।

আলোচনা-বৈঠক বসল সেনাপতিদের নিয়ে।

কেউ বলল—বিঠুরে যাওয়াই ভাল।

কেউ বলল—ফতেপুরে গিয়ে যুদ্ধ করা ভাল।

কেউ বলল—যে-পথ দিয়ে ইংরেজ সৈন্য আসছে, কানপুর থেকে সেইখানে উপস্থিত থাকাই উচিত।

অনেক তর্ক-বিতর্কের পর শেষের প্রস্তাবটাই ঠিক রাখা হলো। কানপুরের রাস্তায় হ্যাভলকের সঙ্গে শক্তির পরীক্ষা করবার জন্য নানাসাহেব আয়োজন করতে লাগলেন।

কিন্তু বিবিঘরের বন্দীদের কি করা যায়? ইংরেজ সৈন্য এসে পড়লে এদের মুক্তি সুনিশ্চিত। অনেকক্ষণ পরামর্শ করার পর বিবিঘরের অসহায় বন্দিনী ও শিশুদের একসঙ্গে মেরে ফেলার হুকুম দেওয়া হলো।

১৬ই জুলাই রাত্রে এই ভীষণ সংহার কার্যের অনুষ্ঠান হলো। আজিমউল্লাই ছিলেন এই অনুষ্ঠানের সর্বেসর্বা। কশাইরা যেমন করে নিরীহ মেষপালকে খোঁয়াড়ের মধ্যে পুরে জবাই করে, ঠিক তেমনি নৃশংস ও নিষ্ঠুরভাবে বিবিঘরের অবরুদ্ধ সেই দু'শো ইংরেজ মহিলা ও বালক-বালিকাদের হত্যা করা হলো।

পরের দিন সকাল বেলায় সেইসব খণ্ড খণ্ড মৃতদেহ কারাগার থেকে বের করে এনে কাছের একটা কুয়োর মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো। ইংরেজদের ওপর চরম প্রতিশোধ নিলেন নানাসাহেব।

॥ তেরো ॥

ইংরেজের বিপক্ষে নানাসাহেব নিজেই এইবার রণসজ্জা করতে লাগলেন।

প্রায় পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। ১৬ই জুলাই দুপুরবেলার মধ্যেই তিনি কানপুর থেকে চার মাইল দূরে সৈন্য সমাবেশ করলেন। যেখানে তিনি ব্যূহ রচনা করলেন সেখান দিয়েই ইংরেজ সৈন্যদের কানপুরে আসবার পথ। পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সব রকম সৈন্যই আছে নানাসাহেবের সঙ্গে। এই অভিযানে তিনি নিজেই সৈনাপত্য গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে আছেন তাঁতিয়া তোপি।

ও-দিকে প্রচণ্ড সূর্যের তাপে দগ্ধদেহ হয়ে সসৈন্যে কানপুরের পথে এগিয়ে আসছেন জেনারেল হ্যাভলক। প্রখর রৌদ্রের ভেতর দিয়ে তাঁর সৈন্যরা বীরদর্পে অগ্রসর হচ্ছে।

দুপুরের আগেই ইংরেজ সেনাপতি বিপক্ষের অবস্থা জানতে পারলেন। রণসজ্জায় নানাসাহেব তাঁর সৈন্যদের যেভাবে সাজিয়ে রেখেছেন, তাতে সেই খবর জানতে পেরে তিনি বুঝতে পারলেন যে বিপক্ষের সৈন্যসজ্জা অতি সাংঘাতিক রকমের। তিনি নিজে বহুদর্শী রণনিপুণ সেনাপতি, তবু সৈন্যসমাবেশে নানাসাহেবের নিপুণতা দেখে হ্যাভলক যারপর নাই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলেন। তাঁর ছিল এক হাজার ইংরেজ সৈন্য আর তিনশো শিখ সৈন্য। হ্যাভলকের সৈন্যরা সরাসরি বড় রাস্তা ধরে মাঝপথের সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হলো।

দুদিকে দুটো বড় বড় রাস্তা, বাঁদিকের রাস্তা কানপুরের ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে আর ডান দিকের রাস্তা দিল্লীর দিকে চলে গিয়েছে। ইংরেজ সৈন্যরা মার্চ করে চলেছে মহা-উৎসাহে। বাঁদিকে গঙ্গা, সেইদিকেই নিচু জমির ওপর বড় বড় কামান।

রাস্তার ডান দিকে মজবুত পাঁচিলেঘেরা একটা গ্রাম, সেই গাঁয়ের মধ্যে অনেকদূর পর্যন্ত আমবাগান। নানাসাহেব তাঁর সৈন্যদের নিয়ে সেই গাঁয়ের আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। জায়গাটা খুবই নিরাপদ। সেখানেও বড় বড় কামান সাজান।

জেনারেল হ্যাভলক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক সড়ক দিয়ে আসবেন, এই অনুমান করে নানাসাহেব রাস্তার দু'ধারে অনেক পদাতিক সৈন্য রেখে দিয়েছিলেন। আর তাদের পেছন দিকে এবং বাঁদিকের মাঝখানে ছিল ঘোড়সওয়ার পল্টন। সৈন্য সাজাবার এই কৌশল দেখে হ্যাভলক ভাবলেন হঠাৎ শত্রুপক্ষের সামনে গিয়ে পড়লেই বিপদ। এনফিল্ড রাইফেলের দূর পাল্লা আর কাপ্তেন কডের কামানের অব্যর্থ গুলির সাহায্যেই এতদিন তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছেন। আজ কিন্তু তিনি হঠাৎ আক্রমণ করতে সাহস পেলেন না। কি কৌশলে যুদ্ধ করবেন, নিজের হাতের তরবারির ডগা দিয়ে মাটিতে দাগ কেটে সেনাপতিদের তা তিনি পরিস্কারভাবে বুঝিয়ে দিলেন। সেইমত সৈন্য সমাবেশ করা হলো।

যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

কানপুরের সিপাহীরা গোলাবৃষ্টি করতে লাগল, ইংরেজ সৈন্য কোনমতেই তাদের তোপ বন্ধ করতে পারল না। হ্যাভলকের হাইল্যাণ্ডার সৈন্যরা বিপর্যস্ত হলো, অনেকে মারা গেল। ইংরেজের কামানের চেয়ে বিদ্রোহীদের কামানের সংখ্যা বেশী। সেসব কামান আকারেও বড়, ওজনেও ভারী। কানপুরের অস্ত্রাগার থেকে সিপাহীরা সেই সব বড় বড় কামান লুঠ করেছিল। কামানের ওপরেই নানাসাহেবের বেশী ভরসা। বিদ্রোহীদের তোপের উপর তোপ দাগাতে লাগল ইংরেজ সৈন্যরা কিন্তু বিশেষ কোন ফল হলো না। তোপের উপর তোপ, দমাদম আওয়াজ হতে লাগল—চারদিকে শুধু গোলাবৃষ্টি। কে হারে কে

জেতে বলা যায় না। কিছুক্ষণ দুই দলেই জয়ের ধ্বনি ওঠে। তারপর সব চুপচাপ। শেষে সেনাপতির আদেশে ইংরেজ সৈন্য কামান ছেড়ে বন্দুক ধরল। গুলিবৃষ্টি করতে করতে তারা এগিয়ে চললো শত্রুর দিকে। কাছে এসে সঙ্গীন দিয়ে আক্রমণ করে ইংরেজ সৈন্য। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারে না সিপাহীরা; তারা কামান ফেলে এদিক-ওদিক পালিয়ে যায়। ইংরেজরা ভাবল সিপাহীদের শক্তি বুঝি ফুরিয়ে গেল। সিপাহীরা পালাতে লাগল। যুদ্ধের পর জয়ের আশা ত্যাগ করে নানাসাহেব যুদ্ধস্থান ত্যাগ করবেন ঠিক করলেন। বিদ্রোহীদের কয়েকটা কামান ইংরেজদের হস্তগত হলো। সিপাহীরা তখন সেই গ্রাম ছেড়ে কানপুরের দিকে পালাল।

কিন্তু শেষপর্যন্ত নানাসাহেব যুদ্ধক্ষেত্রেই রয়ে গেলেন। তখনো তাঁর আশা, আর একবার তিনি পরাক্রম দেখাবেন। তাঁর অধিকারে তখনো একটা চব্বিশ পাউণ্ডের কামান এবং আরো দুটো ছোট কামান ছিল। তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে সে সময়ে আরো নতুন সেনাদল এসে পড়েছে। তাঁর উৎসাহে সৈন্যেরা সতেজ হয়ে ওঠে। হঠাৎ যুদ্ধ-বিরতির ধ্বনি বেজে ওঠে। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য ক্লান্ত, তাই তারা তাদের সেনাপতির আদেশে কিছুকালের জন্যে যুদ্ধে বিরত হলো। ইংরেজ সৈন্য শুয়ে আছে, এমন সময়ে তাদের কানে এল শত্রুপক্ষের জয়োল্লাস-ধ্বনি। নানাসাহেবের শিবিরে ঘন ঘন বাজছিল রণভেরী আর জয়ডঙ্কা। শুয়ে শুয়ে এ-পক্ষের সৈন্যরা তা শোনে; শুনে শুনে তারা বোঝে বিদ্রোহীরা বুঝি গর্ব প্রকাশ করে ইংরেজদের ভয় দেখাচ্ছে। দেখতে দেখতে তুমুল কোলাহল করে নানাসাহেবের সৈন্যরা এগিয়ে আসে। আর তাদের কামান থেকে অবিরত গোলাবৃষ্টি হতে লাগল।

হ্যাভলক বুঝলেন আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। তিনি তখনি সৈন্যদের শত্রুপক্ষের সামনে আসবার হুকুম দিলেন।

সৈন্যরাও প্রস্তুত। কামানের গর্জনের সঙ্গে রণবাদ্যের ধ্বনি সৈন্যদের চিরদিনই উৎসাহিত করে তোলে। তারা বেগে ছোটে —ধনুক থেকে তীর যেমন ছুটে যায়। দুর্বার গতিতে হ্যাভলকের হাইল্যাণ্ডার সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচিয়ে ছোটে। আগে ক'বার জয়লাভ হয়েছে, এবারও জয়লাভ হলেই তাদের পুরোপুরি জয় সুনিশ্চিত। এই আশায় পদাতিকদল এগিয়ে চলে,তাদের পেছনে চৌষট্টি নম্বর পলটনের সৈন্য। একজন মেজর এদের নেতা।

ওদিকে জেনারেল জোয়ালাপ্রসাদের আদেশে বিদ্রোহীরাও তুমুল উৎসাহে এগিয়ে আসছে। চব্বিশ পাউণ্ডের কামানে গোলা ভর্তি করে তারা ইংরেজ সৈন্যদের ওপর লক্ষ্য করছিল। জেনারেল হ্যাভলকের ছেলে কাপ্তেন হ্যারি সেই অবসরে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই কামানের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। শুভ্রকেশ বৃদ্ধ সেনাপতি তাই দেখে একটু উদ্বিগ্ন হলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শেষ সৈন্যদল এসে উপস্থিত হলো। বৃদ্ধ একটু নিশ্চিন্ত হলেন। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পরের মুহূর্তেই আরো চারদল সৈন্য এল। ঘন ঘন গোলাবৃষ্টি, বন্দুকের মুখে অবিশ্রাম গুলির ফোয়ারা। বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হলো। সন্ধ্যাবেলায় ইংরেজ-সৈন্যরা হাতের বন্দুক নামিয়ে একটু বিশ্রাম করল।

ইংরেজরা তখন কানপুর শহর থেকে মাত্র দু'মাইল দূরে।

সকাল হতেই সেনাপতি হ্যাভলক কানপুর অধিকার করতে যাত্রা করলেন।

জয়ের আর আশা নেই দেখে নানাসাহেব কানপুর ছেড়ে বিঠুরে চলে গেলেন।

বিদ্রোহীরা যাবার আগে অস্ত্রাগারটা উড়িয়ে দিয়ে গেল।

১৮ই জুলাই কানপুরে আবার ইংরেজের পতাকা উড়ল।

শহরে বাধা দেবার মত একটি সিপাহীও ছিল না। বিবি-ঘরের হত্যাকাণ্ড আর সতীচৌর ঘাটের নির্মম কাণ্ড শুনে ইংরেজ সেনাপতি শোকে কাতর হলেন। জয়ের আনন্দ যেন নিরানন্দে

পরিণত হলো। তখন ইংরেজ সৈন্যরাও প্রতিহিংসায় ক্ষেপে ওঠে। সামনে যাকে পেল তাকেই তারা হত্যা করল। এমনি করে তারা প্রায় শহরের দশ হাজার লোককে মেরে ফেলল। বেপরোয়া লুঠও চলেছিল। তারা খুঁজে বেড়াল নানাসাহেবকে ও তাঁর দলবলকে। কিন্তু একজনকেও দেখতে পেল না।

হ্যাভলক তখন সৈন্যদের বললেন—নানাসাহেবই এই বিদ্রোহীদলের দলপতি। তিনি বিঠুরে চলে গিয়েছেন, এইমাত্র খবর পেলাম। তোমরা সেখানে গিয়ে তাঁর রাজধানী আক্রমণ কর।

কিন্তু বিঠুর আক্রমণ করা যে সোজা কাজ ছিল না, হ্যাভলক এ-কথাও ভাল করে জানতেন।

হ্যাভলক কানপুরে বসে খবর পেলেন, নানাসাহেব বিঠুরে লুকিয়ে আছেন। গুপ্তচরের মুখে তিনি আরো জানতে পারলেন যে, পাঁচ হাজার বন্দুক ও তরবারি, পঁয়তাল্লিশটা কামান, যথেষ্ট সৈন্য, প্রচুর টাকা আর অন্যান্য সরঞ্জাম বিঠুর মহারাজের হাতে আছে। বিঠুরের প্রাসাদ আক্রমণ করা সহজ নয়—তার চারদিকে গড়। যেমন দুর্ভেদ্য তেমনি সুদৃঢ়। এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে তিনি যে সেই সুদৃঢ় দুর্গ ভেদ করতে পারবেন, তার আশা কম—এই কথাই তখন চিন্তা করলেন সেনাপতি হ্যাভলক। ছেলের সঙ্গে তিনি এ-বিষয়ে পরামর্শ করলেন। বীর সেনাপতির বীর পুত্র বললেন—আমার কিন্তু মনে হয় গোটাকতক ভাঙা কামান নিয়ে নানাসাহেব আর নতুন করে যুদ্ধ করতে সাহস পাবেন না। আপনি বরং এখানে বিশ্রাম করুন, আমি সৈন্য নিয়ে বিঠুরে যাই।

যুদ্ধের শেষে জনকতক সওয়ারকে সঙ্গে করে নানাসাহেব এলেন বিঠুরে।

ঘোড়া ছুটিয়ে যখন তিনি কানপুর শহরের ভেতর দিয়ে বিঠুরে

ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—ফিরিঙ্গীদের কুল প্রায় নির্মূল হয়েছে, তোমরা ভয় পেও না।

ইংরেজের কামান থেকে যারা বেঁচে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেককেই তিনি নিজের হাতে পুরস্কার দিলেন। বিঠুরে এসে নানাসাহেব বুঝলেন যে, আর যুদ্ধ করা বৃথা। মাইনে না পেয়ে তাঁর অনুচররা একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। চির নির্ভিক নানাসাহেবের মনে আজ আতঙ্ক দেখা দিল। কল্পনার চোখে তিনি দেখতে লাগলেন, ইংরেজের বহু সৈন্য বিঠুর ঘিরে ফেলেছে। এই সব চিন্তায় তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তখন আজিমউল্লাকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

আজিমউল্লা আসতেই নানাসাহেব তাঁকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাস করলেন— আজিম, এখন কি করা উচিত ?

—বীরের ধর্ম যুদ্ধ। আপনি বীর, আমি আর কি পরামর্শ দেব, বললেন আজিমউল্লা।

—বীরের ধর্ম যে যুদ্ধ, তা জানি বন্ধু কিন্তু সে-ধর্ম পালনে আমাকে কোন দিন বিরত দেখেছ ? আমি ভাবছি, এইখানে বিঠুরে বসে এই সামান্য সৈন্যবল নিয়ে আমি কি ইংরেজকে ঠেকাতে পারব ?

—তা মনে হয় না।

—তাহলে আত্মসমর্পণ করতে বল আমাকে ?

—না! তাও বলি না।

—তবে ?

—আপনি বিঠুর ছেড়ে চলে যান। বিদ্রোহের এইখানেই তো শেষ নয়। ঝাঁসীতে আপনাকে দরকার হবে। এদিকের বিদ্রোহ দমন করেই ইংরেজ নজর দেবে ঝাঁসীর ওপর। সেখানেও তো বিপ্লবের ধূমায়িত অবস্থা আপনি দেখে এসেছেন।

—ঠিক বলেছ আজিম। আমি বিঠুর ত্যাগ করব। ইংরেজ আমাকে কোন দিনই ধরতে পারবে না।

তারপর রাতের বেলায় প্রাসাদের পুরনারীদের নিয়ে নানা-সাহেব গঙ্গায় নৌকোতে উঠে ফতেগড়ে যাত্রা করলেন। বাইরে প্রচার করা হলো—আত্মহত্যার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। রাত্রির অন্ধকারে কানপুরের ঘাট থেকে নানাসাহেবের নৌকো ছেড়ে দিল। নানাসাহেবের প্রসাদে এক ইংরেজ বন্দিনী ছিল—মিসেস কার্টার। নানাসাহেবের তিনি খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং বিঠুর প্রাসাদের সকলেই তাঁকে ভালবাসত। বিদায়ের সময়ে নানাসাহেব অনেক হীরা জহরত মিসেস কার্টারকে দিলেন আর বললেন—তুমি আজ থেকে মুক্ত।

হ্যাভলক মনে করেছিলেন, নানাসাহেব অনেক সৈন্য নিয়ে আবার ইংরেজ সেনাদলকে আক্রমণ করতে আসবেন। তাই তিনি নবাবগঞ্জের কাছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক সড়কের ধারে একদল নিজের সৈন্য রেখে দিলেন। আর একদল সৈন্য বিঠুরে গিয়ে নানাসাহেবের প্রাসাদ বিধ্বস্ত করে তাঁর সম্পত্তি লুঠ করল।

সেইদিন রাত্রেই সেনাপতি হ্যাভলকের শিবিরে একজন গুপ্তচর খবর নিয়ে এল—নানাসাহেব গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। গঙ্গার তীরে অনেকে নাকি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। যারা দেখেছে তারা পেশবার জন্যে বিলাপ করছে।

গঙ্গাতীরের রাস্তা পরিস্কার। বিঠুরের প্রাসাদ বিনষ্ট—জনশূন্য। বন্দুক-কামানের গর্জন থেমে গিয়েছে। সৈন্যদের আর কোলাহল নেই। শুধু বিবিঘরের বিভীষিকা আর সতীচৌর ঘাটের ভয়াবহ স্মৃতি জেগে রইল ইংরেজদের মনে।

এ ছাড়া ইংরেজের মনে জেগে রইল আর একজনের স্মৃতি—তিনি ধুন্দুপন্থ নানাসাহেব। যদিও সুবেদার রামচন্দ্র পন্থের ছেলে নারায়ণ রাও নিজে হ্যভলককে এসে বললেন—গঙ্গায় নানাসাহেবের নৌকো ডুবে গেছে। তবু বৃদ্ধ সৈনাপতি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, নানাসাহেব সত্যিই মারা গেছেন।

ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন—ফিরিঙ্গীদের কুল প্রায় নির্মূল হয়েছে, তোমরা ভয় পেও না।

ইংরেজের কামান থেকে যারা বেঁচে এসেছিল, তাদের মধ্যে অনেককেই তিনি নিজের হাতে পুরস্কার দিলেন। বিঠুরে এসে নানাসাহেব বুঝলেন যে, আর যুদ্ধ করা বৃথা। মাইনে না পেয়ে তাঁর অনুচররা একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। চির নির্ভিক নানাসাহেবের মনে আজ আতঙ্ক দেখা দিল। কল্পনার চোখে তিনি দেখতে লাগলেন, ইংরেজের বহু সৈন্য বিঠুর ঘিরে ফেলেছে। এই সব চিন্তায় তাঁর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তখন আজিমউল্লাকে ডেকে পাঠালেন তিনি।

আজিমউল্লা আসতেই নানাসাহেব তাঁকে তাঁর মতামত জিজ্ঞাস করলেন—আজিম, এখন কি করা উচিত?

—বীরের ধর্ম যুদ্ধ। আপনি বীর, আমি আর কি পরামর্শ দেব, বললেন আজিমউল্লা।

—বীরের ধর্ম যে যুদ্ধ, তা জানি বন্ধু কিন্তু সে-ধর্ম পালনে আমাকে কোন দিন বিরত দেখেছ? আমি ভাবছি, এইখানে বিঠুরে বসে এই সামান্য সৈন্যবল নিয়ে আমি কি ইংরেজকে ঠেকাতে পারব?

—তা মনে হয় না।

—তাহলে আত্মসমর্পণ করতে বল আমাকে?

—না! তাও বলি না।

—তবে?

—আপনি বিঠুর ছেড়ে চলে যান। বিদ্রোহের এইখানেই তো শেষ নয়। ঝাঁসীতে আপনাকে দরকার হবে। এদিকের বিদ্রোহ দমন করেই ইংরেজ নজর দেবে ঝাঁসীর ওপর। সেখানেও তো বিপ্লবের ধূমায়িত অবস্থা আপনি দেখে এসেছেন।

—ঠিক বলেছ আজিম। আমি বিঠুর ত্যাগ করব। ইংরেজ আমাকে কোন দিনই ধরতে পারবে না।

তারপর রাতের বেলায় প্রাসাদের পুরনারীদের নিয়ে নানাসাহেব গঙ্গায় নৌকোতে উঠে ফতেগড়ে যাত্রা করলেন। বাইরে প্রচার করা হলো—আত্মহত্যার জন্যে তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। রাত্রির অন্ধকারে কানপুরের ঘাট থেকে নানাসাহেবের নৌকো ছেড়ে দিল। নানাসাহেবের প্রসাদে এক ইংরেজ বন্দিনী ছিল—মিসেস কার্টার। নানাসাহেবের তিনি খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন এবং বিঠুর প্রাসাদের সকলেই তাঁকে ভালবাসত। বিদায়ের সময়ে নানাসাহেব অনেক হীরা জহরত মিসেস কার্টারকে দিলেন আর বললেন—তুমি আজ থেকে মুক্ত।

হ্যাভলক মনে করেছিলেন, নানাসাহেব অনেক সৈন্য নিয়ে আবার ইংরেজ সেনাদলকে আক্রমণ করতে আসবেন। তাই তিনি নবাবগঞ্জের কাছে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক সড়কের ধারে একদল নিজের সৈন্য রেখে দিলেন। আর একদল সৈন্য বিঠুরে গিয়ে নানাসাহেবের প্রাসাদ বিধ্বস্ত করে তাঁর সম্পত্তি লুঠ করল।

সেইদিন রাত্রেই সেনাপতি হ্যাভলকের শিবিরে একজন গুপ্তচর খবর নিয়ে এল—নানাসাহেব গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করেছেন। গঙ্গার তীরে অনেকে নাকি এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। যারা দেখেছে তারা পেশবার জন্যে বিলাপ করছে।

গঙ্গাতীরের রাস্তা পরিস্কার। বিঠুরের প্রাসাদ বিনষ্ট—জনশূন্য। বন্দুক-কামানের গর্জন থেমে গিয়েছে। সৈন্যদের আর কোলাহল নেই। শুধু বিবিঘরের বিভীষিকা আর সতীচৌর ঘাটের ভয়াবহ স্মৃতি জেগে রইল ইংরেজদের মনে।

এ ছাড়া ইংরেজের মনে জেগে রইল আর একজনের স্মৃতি—তিনি ধুন্দুপন্থ নানাসাহেব। যদিও সুবেদার রামচন্দ্র পন্থের ছেলে নারায়ণ রাও নিজে হ্যভলককে এসে বললেন—গঙ্গায় নানাসাহেবের নৌকো ডুবে গেছে। তবু বৃদ্ধ সেনাপতি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, নানাসাহেব সত্যিই মারা গেছেন।

॥ চৌদ্দ ॥

গঙ্গার ওপারে ফতেগড়।

ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে নানাসাহেবের নৌকো সকালবেলায় এসে থামল ফতেগড়ের ঘাটে। সেখানে তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে উপস্থিত ছিলেন একমাত্র তাঁতিয়া তোপি। তাঁতিয়া তোপিকে নানাসাহেব বললেন—আমি এখন কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকব। এইখানে এই ভাবেই আমি বিদ্রোহের পরিনাম কি হয়, তা দেখব। আপনি কানপুরে গিয়ে আর একবার ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করুন। আমার গতিবিধি এখন অনিশ্চিত, তবে আমি গুপ্তচর মারফৎ সব সময়েই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ রাখব।

নানাসাহেবের কথামত তাঁতিয়া তোপি কানপুরে ফিরে এলেন।

ভারতের প্রধান সেনাপতি তখন স্যার কোলিন ক্যাম্পবেল।

নানাসাহেবকে পরাজয় করার পর কানপুর অধিকার করে এবং সেনাপতি নীলকে সেখানে রেখে জেনারেল হ্যাভলক তখন লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্যে অভিযান করলেন। কারণ তিন মাস ধরে বিদ্রোহীরা লক্ষ্ণৌ অবরোধ করে আছে। বারুদের স্তূপে আগুন দিয়ে বিদ্রোহীরা মচ্ছীভবন উড়িয়ে দিয়েছে। এইখানে ইংরেজদের যে ত্রিশটা কামান ও গোলগুলি ছিল, সবই ধ্বংস হয়ে যায়। এই মচ্ছীভবনই ছিল তখন লক্ষ্ণৌতে ইংরেজদের আশ্রয়-দুর্গ।

তারপর সিপাহীরা আবার লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী অবরোধ করে। একদিন একটি কামানের গোলায় অতর্কিত আঘাতে অযোধ্যার কমিশনার স্যর হেনরী লরেন্স মারা যান। লক্ষ্ণৌ তখন

অযোধ্যার রাজধানী। অযোধ্যার প্রায় সকল জায়গাতেই তখন ইংরেজের প্রাধান্য লোপ পেয়েছে।

সেনাপতি হ্যাভলককে পথে দু'জায়গায় বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। এই যুদ্ধে জয়লাভ করলেও, তাঁর সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে যায়। তাই তিনি কানপুরে ফিরে আসেন। ভাল রকমে প্রস্তুত হয়ে তিনি আবার লক্ষ্ণৌ যাত্রা করেন, কিন্তু পথে আবার বসিরথগঞ্জে যুদ্ধ হয়। বিদ্রোহীরা হারল বটে, কিন্তু ইংরেজ পক্ষকে খুব দুর্বল করে দিল। হ্যাভলক আবার কানপুরে ফিরলেন, তারপর আবার প্রস্তুত হয়ে লক্ষ্ণৌ যাত্রা করলেন। এবারেও পথে বসিরথগঞ্জে যুদ্ধ হলো। জয়লাভ করলেও সেনাপতিকে আবার কানপুরেই ফিরে আসতে হলো।

এইবার হ্যাভলক বিঠুরে অভিযান করলেন। সেখানে অসীম তেজ ও অমিত পরাক্রম দেখিয়ে বিদ্রোহীরা খুব কৌশলের সঙ্গে ইংরেজ সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সৈন্যই বিজয়ী হয়।

তারপর তিনজন বড় বড় সেনাপতি—হ্যাভলক, আউটরাম ও নীল একসঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর অবরুদ্ধ ইংরেজদের উদ্ধারের জন্য অভিযান করলেন। পথে বিদ্রোহীদের সঙ্গে তাঁদের প্রচণ্ড যুদ্ধ করতে হয়। সেনাপতি নীল এই সময়ে নিহত হন। কিন্তু লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেও তাঁরা বিশেষ কিছু করতে পারলেন না।

শেষে প্রধান সেনাপতিকে স্বয়ং লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্যে আসতে হয়। তিনি অতি কষ্টে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তাঁর সঙ্গে অনেক সৈন্য ও কামান ছিল। পঁচিশটা কামান ও চার হাজার সৈন্য লক্ষ্ণৌতে রেখে, প্রধান সেনাপতি তিন হাজার সৈন্য নিয়ে কানপুরের দিকে যাত্রা করেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর স্যার কোলিন কানপুরে পৌঁছলেন।

এইখানে তাঁকে বাধা দিলেন তাঁতিয়া তোপি।

এই মারাঠি ব্রাহ্মণের রণকুশলতা দেখে প্রধান সেনাপতি

বিস্মিত হলেন। কানপুর থেকে নানাসাহেব চলে যাবার পর তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদের অধিনায়কতা করেন। এই সৈন্যদলের সাহায্যেই তিনি আবার কানপুর উদ্ধারের মতলব করেছিলেন। সৈন্যদল নিয়ে যখন তাঁতিয়া তোপি কানপুর থেকে সাত মাইল দূরে পাণ্ডু নদীর তীরে এসে উপস্থিত হন, তখন কানপুরের সেনাপতি ওয়াইন্ডহ্যাম সসৈন্যে সেখানে অভিযান করেন। ইংরেজদের এই আক্রমণের জন্য তাঁতিয়া তোপি প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। কানপুরে ইংরেজদের সৈন্যসংখ্যা তখন প্রায় আড়াই হাজার।

এই চতুর মারাঠি সেনাপতি কানপুরের দিকে অগ্রসর হবার সময় পথের সব খবরই সংগ্রহ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রচুর সৈন্য সঙ্গে নিয়ে প্রধান সেনাপতি কানপুরে আসছেন, এ-খবরও তিনি পেলেন। তাঁর সঙ্গে তিন হাজার সৈন্য আর বিশটা কামান। তিনি পথের বিশেষ বিশেষ জায়গা অধিকার করে সেইসব জায়গায় একটা করে কামান আর কিছু সৈন্য রেখে দিলেন। এইসব পথ দিয়েই ইংরেজদের রসদ যেত, সেইজন্য তিনি রসদ সরবারাহের পথ বন্ধ করে দিলেন। একদিকে সেনাপতি ওয়াইন্ডহ্যাম, আর অন্যদিকে প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন—এই দুই প্রবল শক্তিকে বাধা দেবার জন্য সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করলেন তাঁতিয়া তোপি।

২৬ শে নভেম্বর। সকাল বেলা।

পাণ্ডু নদীর তীরে এসে সেনাপতি ওয়াইন্ডহ্যাম দেখলেন যে আড়াই হাজার সৈন্য, পাঁচশো ঘোড়সওয়ার আর ছ'টা বড় বড় কামান নিয়ে মারাঠি সেনাপতি তাঁর অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত। তিনি জানতেন এই মারাঠি সেনাপতি যুদ্ধ-কুশলী। ইংরেজ সেনাপতি তাঁর সৈন্যদের আক্রমণ করতে আদেশ দিলেন। দুই দলেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ হলো।

গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীরা খুব সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ করল। প্রথম যুদ্ধে সিপাহীরা পরাজিত হলো, কিন্তু তাঁতিয়া তোপি এতে একটুও দমলেন না। রাত্রির অন্ধকারে তাঁর সৈন্যরা ডান দিক থেকে ইংরেজদের আক্রমণ করল। অর্ধচন্দ্রের মতো তাঁতিয়া তোপি এমন একটা ব্যূহ রচনা করলেন যে, পাঁচ ঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ করেও ইংরেজ সেনাপতি সে ব্যূহ ভেদ করতে পারলেন না, এমন কি মারাঠি বীরের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ইংরেজ সৈন্যরা স্থির থাকতে পারল না। শেষে তারা পিছু হটতে বাধ্য হলো।

এই পিছু হটবার সময়ে ইংরেজ সৈন্যরা সন্ত্রস্ত ও বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল; অনেকেই প্রাণ দিল এবং তাদের অনেক কামান-বন্দুক বিদ্রোহীরা হস্তগত করল। এখানে ইংরেজ সৈন্যের বিষম পরাজয় হলো।

তার পরের দিন তাঁতিয়া তোপি কানপুর অধিকার করলেন। ইংরেজ সৈন্য মাটির দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। তখন সেনাপতি ওয়াইন্ডহ্যাম প্রধান সেনাপতির সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠালেন।

সেই রাত্রেই প্রধান সেনাপতি কানপুরে পৌঁছে ওয়াইন্ড-হ্যামের সঙ্গে মিলিত হলেন। পরের দিন সকালে তাঁতিয়া তোপি দেখলেন গঙ্গার অপর তীরে ইংরেজ সৈন্যের শিবির। অমনি তিনি সেতু পথে বড় বড় কামান সাজালেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যের কামানের মুখে তাঁতিয়া তোপির সৈন্যরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারল না। ইতিমধ্যে কানপুর অধিকারের খবর পেয়ে নানাসাহেব এসে তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। দু'জনার মধ্যে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হলো।

৬ই ডিসেম্বর। দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো।

ইংরেজদের পাঁচ হাজার পদাতিক, দু'শো অশ্বারোহী আর

পঁয়ত্রিশটা কামান। বিদ্রোহীদের আড়াই হাজার সৈন্য আর চল্লিশটা কামান। এরমধ্যে চৌদ্দ হাজার সৈন্য সুশিক্ষিত। বুন্দেলখণ্ড ও মধ্যভারতের সিপাহীরা এসে নানাসাহেবের দল পরিপুষ্ট করছে। সমস্ত সৈন্যদলের অধ্যক্ষ তাঁতিয়া তোপি।

একপক্ষে নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপি দুজনে মিলে সৈন্য পরিচালনা করলেন; অন্যপক্ষে স্বয়ং প্রধান সেনাপতি স্যার কলিন ও সেনাপতি ওয়াইল্ডহ্যাম তাঁদের সৈন্য পরিচালনা করলেন। প্রায় সারাদিন ধরে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ হলো। দুই দলই সাহস ও রণকৌশলের পরিচয় দিলেন। কিন্তু ইংরেজের দুর্ধর্ষ কামানের মুখে বিপক্ষদল কিছুই করতে পারল না।

তাঁতিয়া তোপি পরাজিত হলেন। তাঁর সৈন্য এদিক-ওদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইংরেজ সৈন্যরা চৌদ্দ মাইল পর্যন্ত তাদের পিছু হটিয়ে দিল। বিদ্রোহীদের এইভাবে তাড়িয়ে দিয়ে, রাত্রিকালে তারা কানপুরে ফিরল।

গোয়ালিয়রের সৈন্যরা ঝাঁসীতে গিয়ে সমবেত হলো। তাঁতিয়া তোপি আবার তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। তখন নানাসাহেব বিঠুরে চলে গেলেন। তারপর ইংরেজ সৈন্য আসছে শুনে, তিনি তাঁর কামান ও অনুচরদের নিয়ে আবার অযোধ্যার দিকে চলে গেলেন। ইংরেজ সৈন্য বিঠুরে প্রবেশ করে নানাসাহেবের প্রাসাদ জ্বালিয়ে দিল আর তাঁর দেবমন্দির তোপে উড়িয়ে দিল।

ঝাঁসীর কথা আগেই বলেছি। ঝাঁসী তখন কোম্পানীর রাজ্যে পরিণত হয়েছে। মিরাটে যখন বিদ্রোহের ভেরী বেজে ওঠে, তখন কমিশনার স্কীনের বিশ্বাস ছিল যে, ঝাঁসীর সিপাহীরা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না, কিম্বা বাইরের কোন লোক তাদের উত্তেজিত করতে পারবে না।

১৮ই মে তিনি ঝাঁসী থেকে আগ্রার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর কলভিনকে লিখছেন: এইখানে যে কোন রকম ভয়ের কারণ

আছে, তা আমার মনে হয় না। এখানকার সৈন্যরা বিশ্বস্তভাবে আছে। কাপ্তেন ডানলপ তাদিগকে যোগ্যতার সঙ্গেই পরিচালনা করছেন।

মে মাস কেটে গেল।

জুন মাস এল। ঝাঁসীতে বিপদের কোন সম্ভাবনা নেই। সিপাহীরা বেশ প্রভুভক্ত। কমিশনার স্কীন সাহেব নিশ্চিন্ত। কিন্তু ইংরেজের অগোচরে নানাসাহেব মধ্যভারতে বিপ্লবের যে বীজ বুনেছিলেন, এইবার তাতে ফসল দেখা দিল। একদিন দুপুর বেলায় ছাউনির দু'খানা বাংলো পুড়ে গেল। ৫ই জুন দুর্গ থেকে বন্দুকের শব্দ শোনা গেল। তখন ইংরেজরা তাদের পরিবার-বর্গদের নিয়ে নগরের দুর্গে আশ্রয় নিল। আর অফিসাররা সেনানিবাসে রইলেন।

পরের দিন সকালে কুচ-কাওয়াজ হবে বলে কাপ্তেন সিপাহীদের আদেশ দিলেন। সিপাহীরা কুচ্-কাওয়াজের মাঠে এসে সমবেত হলো, কোনরকম চাঞ্চল্যের পরিচয় দিল না তারা। বাইরে থেকে দেখে তাদের খুব শান্ত বলেই মনে হলো। কিন্তু ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন প্রশান্তভাবে থাকে, সিপাহীরাও তেমনি বাইরে শান্ত রইল।

দুপুর বেলা। কমিশনার স্কীন সাহেব সবেমাত্র মধ্যাহ্ন আহার শেষ করেছেন, এমন সময়ে ঝাঁসীর সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল। একযোগে তারা অফিসারদের উপর গুলি চালাতে লাগল; তাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিহত হলেন। ঝাঁসীর সেনানিবাসের মাটি ইংরেজের রক্তে লাল হয়ে উঠল।

তারপর বিদ্রোহীরা কয়েদীদের কারামুক্ত করল, কাছারি ঘর পুড়িয়ে দিল। শেষে সকলে মিলে দুর্গ অবরোধ করল। দুর্গের কাপ্তেন গর্ডন নিহত হলেন। দুর্গের গোলাগুলি সব ফুরিয়ে গেল।

প্রবলবেগে ঝড় উঠল ঝাঁসীতে। ভীষণ মেঘে চারদিক ছেয়ে গেল। পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবার আর পথ নেই। এখন উপায়?—ভাবল ঝাঁসীর ইংরেজরা। উপায় রাণীর শরণাপন্ন হওয়া। অদৃষ্টের এমনই নিষ্ঠুর পরিহাস যে, একসময়ে যাঁর ওপর ইংরেজরা অন্যায় ব্যবহারের একশেষ করেছিল, আজ তাঁরই শরণ নিতে হলো।

৭ই জুন সকালবেলায় কমিশনার রাণীর কাছে অনুরোধ করে দুজন কর্মচারী পাঠালেন। অনুরোধ এই: দুর্গ থেকে আমরা যাতে নিরাপদে অন্যত্র যেতে পারি, আপনি তার বন্দোবস্ত করুন।

পথিমধ্যেই বিদ্রোহীদের হাতে কর্মচারী দুজন ধরা পড়ে এবং তাদিগকে রাণীর কাছে আনা হয়। রাণী তাদিগকে বিদ্রোহীদের হাতে সমর্পণ করেন। তারা নিহত হয়। সেইদিন কমিশনার রাণীর কাছে বার বার চিঠি লিখলেন। কিন্তু সে-সব চিঠি রাণীর প্রাসাদ পর্যন্ত পৌঁছবার উপায় ছিল না। ফলে দুর্গের ভেতরে ইংরেজদের আতঙ্ক বাড়ে। তখন কাপ্তেন স্কীন আত্মরক্ষার উপায় না দেখে আত্মসমর্পণ করা স্থির করলেন।

ইংরেজরা আশ্রয় পরিত্যাগ করে দুর্গের বাইরে আসতে না আসতেই বিদ্রোহীরা তাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল—যেন ক্ষুধার্ত বাঘ পড়ল মেষপালের উপর। উত্তেজিত সিপাহীদের অস্ত্রের আঘাতে দুর্গের সকল ইংরেজই নিহত হলো। শেষে তাদের মৃতদেহ রাস্তায় টেনে ফেলে দেওয়া হলো। তারপর বিদ্রোহীরা দিল্লীর দিকে চলে গেল। রাণী লক্ষ্মীবাঈ তখন ইংরেজদের শবগুলোর যথারীতি সৎকার করালেন।

যাবার আগে বিদ্রোহীরা রাণীর প্রাসাদ অবরোধ করল। বিদ্রোহীদের দলপতি রাণীকে বললেন—আমরা 'দিল্লী যাচ্ছি, এখনি তিন লক্ষ টাকা না পেলে তোপে প্রাসাদ উড়িয়ে দেবো।

রাণী বুদ্ধিমতী, তিনি তখনি বলে পাঠালেন যে, তাঁর রাজ্য

বা তাঁর সম্পত্তি বলতে এখন কিছুই নেই, সবই কোম্পানী নিয়ে নিয়েছে। তাঁর কাছে তিন লাখ টাকা দূরের কথা তিন পয়সাও নেই। কাজেই তাঁর ওপর অত্যাচার করা উচিত নয়। তখন সিপাহীরা অন্য একজনকে ঝাঁসীর গদিতে বসাবে বলে ভয় দেখাল। রাণী নিরুপায় হলেন। শেষে পুত্র দামোদর রাও-এর মুখ চেয়ে রাণী তাঁর নিজ সম্পত্তি থেকে এক লক্ষ টাকা দিয়ে সিপাহীদের শান্ত করলেন। টাকা পেয়ে সিপাহীরা আনন্দে বলে উঠল—মুলুক খোদাকা, মুলুক বাদশাহকা, অম্মল (আমল) রাণী লক্ষ্মীবাঈকা। এই বলতে বলতে বিদ্রোহীরা দিল্লীর পথে ছুটল।

ঝাঁসীতে ইংরেজের প্রাধান্য লোপ পেল।

ইংরেজের অনুপস্থিতিতে রাণী ঝাঁসীর শাসনভার নিজের হাতে নিলেন।

তবে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ আগে থেকেই রাণীর ওপর বিরূপ ছিলেন; কোন কথা না শুনেই তাঁরা রাণীকে দোষী সাব্যস্ত করলেন। লক্ষ্মীবাঈ বিপদে পড়লেন। তাঁকে এই বিপদে রক্ষা করবে এমন কোন লোকই তিনি পেলেন না। তা ছাড়া, তাঁরই আত্মীয়, সদাশিব রাও ঝাঁসীর রাজা হবার জন্যে এই সুযোগে রাণীর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং নিজেকে ঝাঁসীর মহারাজা বলে ঘোষণা করলেন। রাণী সৈন্য সংগ্রহ করে সদাশিবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাঁকে বন্দী করলেন। কিন্তু একটা বিপদ কাটতে না কাটতেই আর একটা বিপদ এসে উপস্থিত হলো।

ঝাঁসীর কাছেই বোর্ছা-রাজ্য। সেই রাজ্যের দেওয়ান নথে খাঁ। তিনিও এই সুযোগে কুড়ি হাজার সৈন্য নিয়ে ঝাঁসী আক্রমণ করতে এলেন। রাণীর এসময়ে অত সৈন্য ছিল না। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ঝাঁসী নেবার পর থেকে সৈন্যের সংখ্যা অনেক কমিয়ে দিয়েছিলেন। কামান ও গোলা-বারুদ তেমন কিছু ছিল

না। কিন্তু রাণী এতে ভয় পেলেন না। তিনি বুন্দেলখণ্ডের সর্দারদের আহ্বান করলেন। তাঁরা সাড়া দিলেন এবং সসৈন্যে ঝাঁসিতে এসে সমবেত হলেন। গোলা বারুদ প্রভৃতি তৈরি করার জন্যে রাণী একটা কারখানা খুললেন। দুর্গের মধ্যে মাটির নীচে ও প্রাসাদের ভেতরে যে চারটা কামান লুকান ছিল, রাণী সে-সব কামান নিয়ে আসলেন। দুর্গের প্রাচীরে কামানগুলো সাজিয়ে রাখা হলো।

যুদ্ধ শুরু হলো।

বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈ কুলবধূর বেশ ছেড়ে পাঠানীর বেশ ধারণ করলেন এবং তরবারি হাতে নিয়ে দুর্গের উপর বসে রইলেন। দুর্গের উপরে উড়ল ঝাঁসীরাজের পতাকা।

নথে খাঁ দুর্গ আক্রমণ করলেন, কিন্তু কিছুই করতে পারলেন না। তাঁর পরাজয় হলো। তখন দুইপক্ষে সন্ধি হলো। বোর্ছার রাণীর সঙ্গে ঝাঁসীর রাণীর বন্ধুত্ব হলো।

লক্ষ্মীবাঈ তখন ইন্দোরের রাজ প্রতিনিধি স্যার হ্যামিলটনের কাছে এই ঘটনা লিখে পাঠালেন। কিন্তু নথে খাঁর চক্রান্তে এই চিঠি হ্যামিলটনের হাতে পৌঁছল না। নথে খাঁ তখন সমস্ত বিষয়টা উল্টো করে হ্যামিলটনের কাছে লিখলেন।

ঠিক এই সময়ে ঝাঁসীর আশে-পাশের আরো দু'একটা ছোটখাট রাজ্য ঠিক ঐভাবে রাণীর বিরুদ্ধে ইংরেজের দরবারে নালিশ জানাল। রাণীই বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন —এই ধারণাই তখন ইংরেজদের মনে বদ্ধমূল হলো। যে রাণী কোম্পানীর প্রাধান্য বজায় রাখবার জন্যে এত করলেন, তাঁর সম্বন্ধে রাজপুরুষদের এখন উল্টো ধারণা হলো। রাণী দুঃখিত হলেন। ইংরেজের এই সন্দেহই তাঁকে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের পথে টেনে নিয়ে এল।

ঝাঁসীতে কোম্পানীর সব ক্ষমতা লোপ পাবার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেল। এই দশ মাস রাণী লক্ষ্মীবাঈ খুব দক্ষতার

সঙ্গে রাজ্যশাসন করেন। তিনি কখনো নারী বেশে, কখনো বা পুরুষের বেশে রাজকার্য পরিচালনা করতেন, সব সময়েই তাঁর কোমারে ঝুলত সুতীক্ষ্ণ তরবারি। আবার মায়ের মতো অপার স্নেহে আহতদের সেবাও তিনি করতেন।

তিনি রাজ্যে ট্যাঁকশাল স্থাপন করলেন, দুর্গ মেরামত করলেন, সৈন্য জোগাড় করলেন, এবং কামান তৈরি করালেন। ইংরেজের সঙ্গে একদিন না একদিন সংঘর্ষ বাধবে জেনেই, নানাসাহেবের নির্দেশে রাণী লক্ষ্মীবাঈ এইভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। নানাসাহেব এই সময়ে তেহরীর এক গুপ্তস্থানে বাস করছিলেন। একদিন গুপ্তচর মারফৎ খবর পাঠাতেই রাণী নিজে নানাসাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। তখন তাঁদের মধ্যে অনেক এসে কথা হয়।

—ইংরেজ ঝাঁসী আক্রমণ করবেই, বললেন নানাসাহেব।

—আমারও তাই মনে হয়। কেন না, আমি এত করে হ্যামিলটনকে সব লিখে জানালাম, তবু কিনা ইংরেজ আমাকেই সন্দেহ করে বসল। লক্ষ্মীবাঈ-এর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ যেন ফেটে পড়ছিল।

—বোন, এই তোমার সুযোগ! মনে করে দেখ ইংরেজ তোমার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেছে। আজ তার প্রতিশোধ নেবার জন্যে তৈরী হও। আমার মান-সম্মান গেছে, বিঠুর গেছে, তবু আমি দমিনি। তোমার সাহায্যের জন্যে তাঁতিয়া তোপি এখনও আছে।

ক্রমে ইংরেজের এই সন্দেহ থেকেই রাণীকে ইংরেজের শত্রু করে তুলল। তারপর সত্যসত্যই একদিন ইংরেজ সেনাপতি ঝাঁসীর বিরুদ্ধে অভিযান করলেন।

॥ পনেরো ॥

১৮৫৮ সালের মার্চ মাস।

ইংরেজ সেনাপতি স্যার হিউরোজ ঝাঁসী আক্রমণ করলেন। ঝাঁসীর দরবারে তখন নবীন দেওয়ান লক্ষ্মণ রাও। তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধি তেমন ছিল না। তাই রাণী তাঁর ওপর বিশেষ ভরসা করতে পারলেন না। তিনি দেওয়ানকে ইন্দোরে রাজপ্রতিনিধি স্যার রবার্ট হ্যামিলটনের কাছে একজন উপযুক্ত দূত পাঠাতে বললেন। দেওয়ান এমন একজন লোককে পাঠালেন যে, সে ইন্দোরে তো গেলই না, এমন কি হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না, উল্টো ঝাঁসী দরবারের নামে অনেক অকথ্য সব কথা লিখে পাঠাল।

ফলে রাণীর ওপর কোম্পানীর সন্দেহ গভীর হয়ে উঠল। দূতের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই এতটা হলো। রাণীর ঘোর দুর্দিন উপস্থিত হলো। এই বিপদের দিনে তাঁর দরবারে এমন কোন লোক ছিল না যার ওপরে তিনি ভরসা করতে পারেন। তাছাড়া রাণী দুর্গেই থাকতেন, বাইরের খবর তাঁর কাছে খুব কমই আসত। এদিকে তাঁরই কর্মচারীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সকলকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করতে লাগল। রাণী তখন বাধ্য হয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি হতে লাগলেন।

রাণী বুঝলেন যুদ্ধ ছাড়া আর উপায় নেই। একে ইংরেজ সৈন্য নগরের খুব কাছে এসে পড়েছে, তার ওপর সময়ও কম, এর মধ্যে যুদ্ধের ব্যবস্থা করা সহজ কথা নয়। কিন্তু লক্ষ্মীবাঈ এই দুঃসাধ্য কাজই করলেন। একে একে যুদ্ধের সমস্ত বন্দোবস্তই তিনি করলেন। ঝাঁসীর মেয়েরাও তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। ইংরেজ তার সকল ক্ষমতা নিয়ে ঝাঁসী

আক্রমণ করল উঁচু পাহাড়ের ওপর ঝাঁসীর দুর্গ। এই দুর্গ ছিল অজেয়। দুর্গের চারদিকে দুর্ভেদ্য প্রাচীর। দুর্গের চারদিকে ঝাঁসী শহর। শহরের চারদিকেও উচ্চ প্রাচীর। সেই প্রাচীরে কামান রাখবার ব্যবস্থাও ছিল।

২১শে মার্চ ইংরেজ সেনাপতি ঝাঁসীতে উপস্থিত হলেন। বিশ হাত উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ঝাঁসী শহরের পরিধি ছিল সাড়ে চার মাইল। সেখান থেকেই দু'দিন পরে দুই দলে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। ঝাঁসীর গোলন্দাজদের পরাক্রম দেখে ইংরেজ সেনাপতি বিস্মিত হলেন—তাঁর উদ্যম ব্যর্থ হয়ে গেল। রাতের বেলায় ইংরেজ সৈন্যরা সুযোগ বুঝে এগিয়ে এল।

কিন্তু রাণীও চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁর সেনাদলের মধ্যে সারা রাত যুদ্ধের আয়োজন চললো। সারা রাত চারদিকে যুদ্ধের বাজনা। সকল শহর মশালের আলোয় আলোকিত। সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোলন্দাজেরা দুর্গের প্রাচীর থেকে কামানের গোলা চালাতে লাগল। প্রথম দু'দিনের যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য কিছুই করে উঠতে পারল না। রাণীর অপূর্ব রণকৌশল দেখে স্যার হিউ রোজ বিস্মিত হলেন। ঝাঁসীর শক্তি সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে গেল।

২৫শে মার্চ ইংরেজ সৈন্যরা দুর্গের দক্ষিণ দিক আক্রমণ করল। এই দিনের যুদ্ধে রাণীর গোলন্দাজ ঘাউশ খাঁ দক্ষিণ দিকের বুরুজ থেকে এমন তীব্র বেগে গোলাবৃষ্টি করতে লাগল যে, তার ফলে ইংরেজ সৈন্যের তোপ বন্ধ হয়ে গেল। এই ভাবে মার্চ মাসের শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে দিনরাত তুমুল যুদ্ধ চললো। রাণীর রণকৌশলে ইংরেজদের সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হতে লাগল।

রাণী দুর্গের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন, সৈন্যদের উৎসাহ দিতেন আর আহতদের সেবা করতেন। নগরের যেখানে যেখানে যাওয়া দরকার, সেখানে গিয়ে তিনি নিজে সৈন্য সমাবেশ করতেন। একে তিনি খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁর সৈন্যদল গঠন করেছেন,

তাতে আবার তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যও খুব বেশী নেই, তার ওপর ৩রা এপ্রিল রাণীর এক সর্দার বিশ্বাসঘাতকতা করে, নগরের প্রধান প্রবেশ পথ বোরছা দরওয়াজা অধিকার করতে ইংরেজদের সাহায্য করল। তখন ইংরেজ সৈন্য মই দিয়ে পাঁচিলে উঠে নগরে প্রবেশ করল। নগরে প্রবেশ করে তারা যে যে পথ দিয়ে গেল, সেই সেই পথের দু'পাশে সব ঘরেই আগুন লাগিয়ে দিল, এবং যাকে পেল তাকেই মেরে ফেলল। তারপর তারা প্রাসাদ আক্রমণ করল। প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যরা বীরত্বের অপূর্ব নিদর্শন দেখিয়ে প্রাণ দিল।

৩১শে মার্চ ইংরেজ সেনাপতি হঠাৎ খবর পেলেন যে, উত্তর দিক থেকে অবরুদ্ধদের উদ্ধার করতে একদল সৈন্য আসছে—এই সৈন্য তাঁতিয়া তোপির। কানপুর যুদ্ধের পর তাঁতিয়া তোপি নানাসাহেবের কথামত কাল্পীতে উপস্থিত হন। এইখান থেকেই তিনি রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনার চিঠি পান। চিঠি পেয়ে তিনি নানাসাহেবের আদেশ জানতে চাইলেন। তিনি তাঁর আত্মগোপনের জায়গা থেকে তাঁতিয়া তোপিকে বলে পাঠালেন—যেমন করে হোক ঝাঁসীকে যেন ইংরেজদের হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

তাঁতিয়া তোপি তখনি কুড়ি হাজার সৈন্য ও আঠাশটা কামান নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। তাঁতিয়া তোপি অনেক সৈন্য নিয়ে ঝাঁসীতে আসছেন শুনে ইংরেজ সেনাপতি চিন্তিত হলেন। কে জানে, তাঁতিয়া তোপির পেছনে নানাসাহেব আছেন কি-না! ঝাঁসীর দুর্গ তখনো পর্যন্ত তিনি অধিকার করতে পারেন নি; দুর্গের বীর সৈন্যরা তখনো ইংরেজ সৈন্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করে নি। সকলের ওপর, রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর সাহস বা উৎসাহ দুই-ই সমান রয়েছে। এমন অবস্থায় এই সংবাদ, দুঃসংবাদ বৈ কি! ভাবলেন স্যার হিউ রোজ তাঁর শিবিরে বসে।

বেত্রবতী নদী তীরের কাছেই তাঁতিয়া তোপির শিবির। সেখান থেকে তিনি প্রথমে একদল সৈন্য ঝাঁসী পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ সেনাপতিও কিছু সৈন্য দুর্গ অবরোধ করার জন্যে রেখে দিয়ে, বাকী সৈন্য তিনি তাঁতিয়া তোপির অগ্রগামী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন। ইংরেজ সৈন্যের আক্রমণে তাঁতিয়া তোপির সৈন্যরা পরাজিত হলো এবং তাদের অনেক-গুলো কামান ইংরেজদের হস্তগত হলো। তখন তাঁতিয়া তোপি সেখান থেকে শিবির উঠিয়ে নিয়ে কাল্পীর দিকে চলে গেলেন। ইংরেজ সৈন্য নগর অধিকার করেছে শুনে রাণী দুর্গে গিয়ে রইলেন।

এই সময়ে বিপক্ষকে বাধা দেওয়া রাণীর অসাধ্য হয়ে উঠল। তাঁর অনেকগুলো গোলন্দাজ যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছিল, বিশ্বস্ত সৈনিকদের অনেকেই নিহত। তাই অন্য উপায় না দেখে, তিনি ঝাঁসী ছেড়ে যাবেন ঠিক করলেন। সব আয়োজন ঠিক হলো। বিশ্বস্ত অনুচরেরা সজ্জিত হলো। রাণী নিজে পুরুষের বেশে সজ্জিত হলেন। পুত্র দামোদর রাওকে পিঠের সঙ্গে কাপড় দিয়ে বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। সঙ্গে গেলেন তাঁর বাবা মোরোপন্ত তাম্বে। একটা হাতীর হাওদার মধ্যে মণিমাণিক্য প্রভৃতি পুরে নেওয়া হলো।

এই ভাবে প্রস্তুত হয়ে ৪ঠা এপ্রিল গভীর রাত্রির দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আত্মগোপন করে দুর্গের উত্তর দরজা দিয়ে ঝাঁসীর কুললক্ষ্মী রাণী লক্ষ্মীবাঈ পালিয়ে গেলেন। শিবিরে বসে ইংরেজ সেনাপতি এই খবর পেলেন। তখনি তাঁকে ধরবার জন্যে সৈন্য পাঠালেন, কিন্তু কেউই তাঁকে ধরতে পারল না। ধরা পড়লেন শুধু মোরোপন্ত। তারপর রাজপ্রতিনিধি হ্যামিলটনের আদেশে তাঁর ফাঁসি হলো।

রাণী চলে যাবার পর ইংরেজ সৈন্যরা ঝাঁসীতে খুব অত্যাচার আরম্ভ করল। পাঁচ পাঁচ হাজার নিরীহ অধিবাসীকে তারা

বধ করল। মেয়েরা কূয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরল। ঝাঁসীর দুর্গ ও নগর বিলুণ্ঠিত হলো। এইভাবে বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্যে এবং তের দিন দিনরাত যুদ্ধের পর ঝাঁসী রাজ্য আবার কোম্পানীর অধিকারে এল।

কাল্পী।

এইখানে পৌঁছে লক্ষ্মীবাঈ, শেষবারের মতো নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপির সঙ্গে মিলত হলেন। রাণীর সঙ্গে সৈন্য ছিল না। তিনি নানাসাহেবের কাছে সৈন্য চাইলেন। তিনি আরও বললেন—সৈন্য ও কামান যা আছে, এসব নিয়েই আমরা হিউ রোজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

তারপর কাল্পী থেকে চল্লিশ মাইল দূরে আবার ইংরেজের সঙ্গে তাঁতিয়া তোপির সৈন্যদের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। এবারও তিনি বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারলেন না। রাণী নিজেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

রাণী কিন্তু এতটুকু দমলেন না। সেই তেজ, সেই বীরত্ব আর সেই উৎসাহ নিয়ে তিনি সৈন্যদের পরিচালনা করতে লাগলেন। তারপর কাল্পী থেকে দু'মাইল দূরে যমুনার ধারে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাণী এমন বীরত্বের পরিচয় দিলেন যে, সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যকেও হটে যেতে হলো। এই যুদ্ধে বাঁদার নবাব রাণীকে সৈন্য ও কামান দিয়ে সাহায্য করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরই জয় হয়। রাণীকে ফিরতে হলো।

তারপর লক্ষ্মীবাঈ গোয়ালিয়রে এলেন। সঙ্গে আছেন নানাসাহেব ও তাঁতিয়া তোপি। তাঁরা গোয়ালিয়রের দুর্গ অধিকার করবেন বলে প্রথমে স্বজাতি ও স্বধর্মের দোহাই দিয়ে সেখানকার সিপাহীদের হাত করলেন। কিন্তু গোয়ালিয়রের মহারাজা, মুখে সহানুভূতি দেখালেও, তাঁর মন্ত্রী দিনকর রাও-এর পরামর্শে তিনি গোপনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে খবর দিলেন। শুধু

তাই নয়! রাত্রি ভোর না হতেই মহারাজা নিজে বহু সৈন্য নিয়ে রাণীকে আক্রমণ করলেন।

নানাসাহেব প্রথমে এই বিশ্বাসঘাতকতা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু রাণী পেরেছিলেন। তিনি মাত্র দু'শো যোদ্ধা নিয়ে, রণরঙ্গিনী মূর্ত্তিতে এমন তেজের সহিত মহারাজার গোলন্দাজদের আক্রমণ করলেন যে, তারা শেষে কামান ফেলে পালিয়ে গেল। মহারাজার সৈন্য অনেক ছিল, তবু তিনি পরাজিত হয়ে আগ্রায় পালিয়ে গেলেন। বীরাঙ্গনার এই বীরত্বে সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন।

গোয়ালিয়রের দুর্গ ও ধনাগার রাণীর অধিকৃত হলো।

নানাসাহেব মারাঠাদের পেশোবা বলে আর একবার ঘোষিত হলেন। তাঁতিয়া তোপি হলেন গোয়ালিয়রের শাসন-কর্তা। এমন সময়ে ইংরেজ সেনাপতি আবার বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। নানাসাহেব তাঁতিয়া তোপিকে যুদ্ধযাত্রা করতে আদেশ দিলেন। তাঁতিয়া তোপি তাঁর সৈন্যদল নিয়ে ইংরেজ সেনাপতির অভিমুখে অগ্রসর হলেন।

১৮ই জুন। গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্র।

এই দিনের স্মরণীয় যুদ্ধে রাণী লক্ষ্মীবাঈ সারাদিন বীর পুরুষের বেশে সজ্জিত থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করলেন, আর সৈন্যদের উৎসাহ দিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী সেদিন লক্ষ্মীবাঈ-এর ওপর বিমুখ। তাই যুদ্ধে জয়ের আশা নেই দেখে, বীরাঙ্গনা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সঙ্গে রইল মাত্র কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর। তার ওপর তখন তাঁর নিজের ঘোড়া খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেইজন্য তিনি মহারাজার আস্তাবল থেকে অন্য একটা ঘোড়া নিলেন। সেই ঘোড়ায় চড়ে তিনি রণস্থল পরিত্যাগ করলেন।

ঘোড়া রাণীকে পিঠে করে সবেগে ছুটল। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর সামনে পড়ল একটা ছোট খাল। ঘোড়া কিছুতেই

সেই খাল পার হতে চাইল না। রাণী মহা বিপদে পড়লেন। অনেক চেষ্টা করলেন, তবুও ঘোড়া আর এক পা-ও নড়ল না। তখন বুঝলেন, মুহূর্তের বিলম্বে বিপদ সুনিশ্চিত। রাণী একটু ভাবলেন, এদিক-ওদিক একবার তাকালেন। এমন সময়ে কয়েকজন ইংরেজ অশ্বারোহী সেখানে এসে উপস্থিত হলো।

রাণী একা। এ-সুযোগ ইংরেজ সৈন্যরা কিছুতেই ছাড়বে না। আক্রমণ করল রাণীকে। রাণীও খাপ থেকে তরবারি বের করলেন এবং কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। তারপর আর একদল ইংরেজ সৈন্যের তরবারি এসে পড়ল রাণীর মাথায়। তাতে একদিক কেটে দর দর ধারে রক্ত ঝরতে লাগল। রাণীর ভ্রূক্ষেপও নেই তাতে। তখনো তিনি তরবারি ঘুরিয়ে প্রতিপক্ষের আঘাত ঠেকাচ্ছেন। আবার একজন সৈন্য তার বন্দুকের সঙ্গীন দিয়ে রাণীর বুকে আঘাত করল। এ-আঘাত পেয়েও তিনি শত্রুকে বিনাশ করলেন। কিন্তু আর কতক্ষণ তিনি একা যুদ্ধ করবেন?

রাণী তখন তাঁর একজন অনুচরকে ইঙ্গিত করলেন। সে তাঁকে কাছাকাছি এক সাধুর পর্ণকুটিরে নিয়ে গেল। সেইখানে ছেলের দিকে মুখ রেখে, রাণী তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নিবিড় অরণ্যের গাঢ় ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল বীরত্বের একটি জ্বলন্ত শিখা।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাঁতিয়া তোপি চলে গেলেন জয়পুরের দিকে। মধ্যভারতের বন-জঙ্গল আর পাহাড়-পর্বতের মধ্যে তিনি ন'মাস ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতিরা তাঁর পিছু নিয়ে এই সুচতুর মারাঠি বীরকে কিছুতেই ধরতে পারল না। অবশেষে তাঁর এক বিশ্বাসঘাতক সহচর তাঁকে ধরিয়ে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থায় ইংরেজ সৈন্য তাঁতিয়া তোপিকে বন্দী করে। কেন না, সজাগ অবস্থায় মারাঠার এই দুরন্ত সিংহকে ধরা ইংরেজের সাধ্য ছিল না। বিচারে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডের

আদেশ হয়। ১৮৫৯ সালের ১৮ই এপ্রিল তাঁর ফাঁসি হয়। বীরত্বের আর একটি শিখা এইভাবে নিভে যায়।

আর নানাসাহেব ?

কোথায় যে তিনি আত্মগোপন করলেন, ইংরেজ অনেক করেও খুঁজে তা জানতে পারল না। তাঁর মাথার দাম একলক্ষ টাকা বলে কোম্পানী থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু সেই এক লাখ টাকার পুরস্কার এই এক শো বছরের মধ্যে কেউ নিতে পারল না—কেউ বলতে পারল না নানাসাহেব কোথায় ?

জনরব এই যে, তিনি গোয়ালিয়রের যুদ্ধের পর নেপালের দিকে চলে যান এবং সেখান থেকে মণিপুরে গিয়ে মণিপুরের বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। যাই হোক, নিরুদ্দিষ্ট এই বিদ্রোহীর জন্যে ইংরেজ অনেকদিন পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিল। কিন্তু ইতিহাসের নিস্তব্ধ প্রান্তরে আজো শোনা যায় সেই বিদ্রোহীর ক্রুদ্ধ পদধ্বনি আর কালের প্রান্তরে আজো প্রতিধ্বনিত হয় তাঁর সেই অগ্নিক্ষরা বাণী—কী অধিকার আছে তোমার ইংরেজ, আমার দেশ তুমি শাসন কর ? ফিরিঙ্গীর শাসন আমি মুছে দেব ভারতবর্ষ থেকে। স্বাধীন করব আমার জন্মভূমিকে। দরকার হলে তার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

এই ছিলেন নানাসাহেব।

দিন যায়। বিদ্রোহের ওপর যবনিকা পড়েছে।

কঠোর হস্তে ইংরেজ তখন এই বিদ্রোহ-দমনের কাজে ব্যস্ত। কোম্পানীর রাজত্ব বিলুপ্ত হয়েছে। ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর এলাহাবাদের দরবারে সাড়ম্বরে ঘোষিত হলো মহারাণীর ঘোষণা পত্র। দূর অজ্ঞাতবাস থেকে নানাসাহেব তাঁর বিশ্বাসী গুপ্তচরদের মারফৎ এই ঘোষণাপত্রের কথা জানতে পারলেন। তারপর সেই

অজ্ঞাতবাস থেকেই তিনি তাঁর এক প্রতিনিধি মারফৎ বড়লাটকে একখানা চিঠি পাঠালেন। সেই চিঠিতে নানাসাহেব লিখলেন :—

"আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত এবং এই চিঠি লিখিবার সময় পর্যন্ত আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। জানিবেন, আমি যতদিন বাঁচিব ততদিন আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিব। শুনিলাম, ঘোষণাপত্রে আমার সম্বন্ধে কোনো আদেশ দেওয়া হয় নাই। আমি ছাড়া বর্তমানে আপনাদের আর কেহই শত্রু নাই, সুতরাং যতকাল বাঁচিব ততদিন আমি যুদ্ধ করিব।...আমি আবার ইংরেজের রক্তপাত করিব।...মহারাণীর নিজের হাতে শীলমোহর করা চিঠি আমি চাই, তাহা না হইলে আমি কোনো শর্তেই রাজী হইব না। মহারাণীর সই-করা চিঠি পাইলে আমি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছি।"

নানাসাহেব অবশ্য আত্মসমর্পণ করেন নি আর ইংরেজও শেষ পর্যন্ত তাঁর কোনো সন্ধানই পেল না। নিরুদ্দিষ্ট সেই বিদ্রোহী—সেই মারাঠাবীর অনেকদিন পর্যন্ত ইংরেজের দুশ্চিন্তার বিষয় ছিলেন।

আজ শতবর্ষ পরে বিদ্রোহী ভারতের সেই বীরকে আমরা জানাই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।